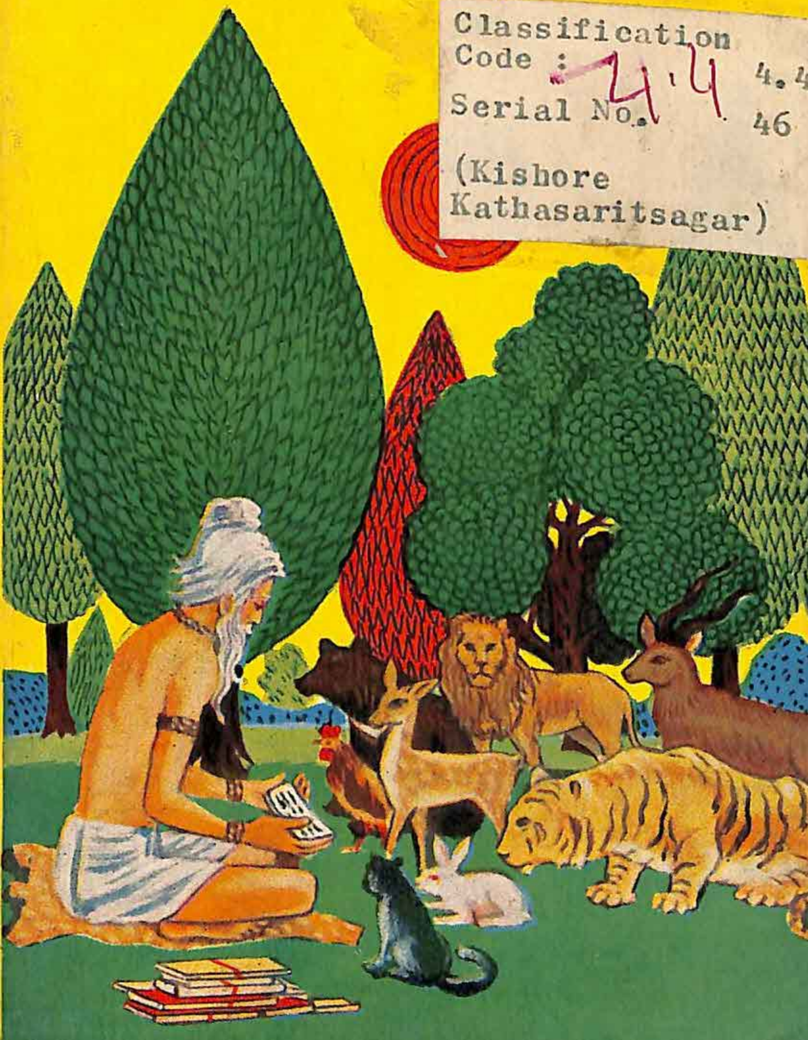
কিশোর কথাসরিৎসাগর

দিলীপ মজুমদার



কিশোর কথাসরিৎসাগর

হর্ষবর্ধনের নানারঙগ
শিব্রাম চকরবরতি

ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা
ঘুড়িও ওড়ালেন
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভদ্রলোক চোর
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৮
মূল্যঃ সাড়ে চার টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ
নিমাই নন্দী

৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩
শান্তিমোহন হাউস, ১৬-আই/১ আনসারি রোড, দিল্লী-১১০০০২

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩-এর পক্ষে শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং অজন্তা প্রিন্টার্স, ৪/২ রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯-এর পক্ষে শ্রীতপনকুমার বারিক কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমান্ নীলেন্দু ঘোষ
প্রীতিভাজনেষু

কথাসরিৎসাগরের জন্ম

কথাসরিৎসাগরের গল্প শুনবে তোমরা।

কিন্তু তার আগে কি করে জন্ম হল কথাসরিৎসাগরের—সেই গল্প শোন।

সে এক মজার কাহিনী।

কিন্তু গল্প।

শিবের এক গণ ছিল। নাম তার পুষ্পদন্ত। বড় ভালোবাসতেন শিব তাকে। পুষ্পদন্তের স্ত্রীর নাম জয়া। সে ছিল দুর্গার দাসী। দুর্গাও তাকে ভালোবাসতেন খুব।

একদিন দেবী দুর্গার অনুরোধে শিব তাঁকে কথাসরিৎসাগরের গল্প শোনাচ্ছিলেন। দরজা বন্ধ। কেউ যেন এ সময় কোন গোলমাল না করে—কড়া হুকুম ভোলানাথ শিবের। দরজায় পাহারা দিচ্ছে নন্দী।

শিবের মুখে সেই গল্প শোনার বড় লোভ হল পুষ্পদন্তের। মন্ত্রবলে সে নিজেকে অদৃশ্য করে সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। গল্পে মশগুল শিব দুর্গা। তাঁরা কেউ জানলেন না। নন্দী অবশ্য নিষেধ করেছিল। পুষ্পদন্ত শোনে নি।

পুষ্পদন্ত সেই গল্প শুনে তার স্ত্রী জয়ার কাছে সেই সব গল্প করেছিল। বোকা পুষ্পদন্ত। বলে দেয় নি জয়াকে যে, দুর্গার কাছে সে যেন কিছু প্রকাশ না করে।

জয়া কিছুদিন পরে কথায় কথায় দুর্গার কাছে সেই গল্প করল। দেবী দুর্গা গিয়ে ধরলেন শিবকে।—তুমি বলেছিলে কথাসরিৎসাগরের গল্প আর কেউ জানে না, তাই না?

—জানে না তো। আনকোরা নতুন গল্প।

—বাজে কথা। জানে অনেকে।

দুর্গার রাগত গলা শুনে টনক নড়ল শিবের। স্ত্রী তাঁর রাগেন

কম। কিন্তু রাগলে রক্ষা নেই আর। তাছাড়া, শিব তো সত্যি কথাই বলেছেন। এ কাহিনী তাঁর মনেই ছিল। তাঁর মনের কথা অন্য কেউ জানবে কেমন করে?

—জানে বলে কে বলেছে তোমাকে?

—কেন, বলেছে জয়া। পুষ্পদন্তের বউ। সে তো আজ আমাকে দু' একটা গল্পই শুনিয়ে দিল।

থমথমে হয়ে উঠল শিবের মুখ।

তাঁর তিন নম্বর চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। সৃষ্টি, স্থিতির দেবতা যেমন তেমনি তিনি প্রলয়েরও দেবতা। নটরাজ তিনি। তাঁর পায়ের তালে তালে নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু।

—জয়া বলেছে? পুষ্পদন্তের বউ?

—হ্যাঁ।

কিন্তু জয়া জানল কি করে? তবে কি তাকে বলেছে পুষ্পদন্ত? পুষ্পদন্তই বা জানল কি করে? ঠোঁট কামড়ে শিব ভাবতে থাকেন।

কি করে জানল পুষ্পদন্ত?

শিবের অস্ত্র ধ্যান। ধ্যানে অন্যের মনের রহস্য জানা যায়। শিব ধ্যানে জানতে পারলেন সব ঘটনা। সব বললেন তিনি দুর্গাকে।

দুর্গা অভিশাপ দিলেন ঃ পুষ্পদন্ত পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

বড় কঠোর অভিশাপ।

স্বর্গের সুখভোগ ছেড়ে পৃথিবীতে যাওয়া? পৃথিবী মানেই তো কষ্ট। বেঁচে থাকার জন্য সেখানে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়। পথে পথে কাঁটা, পদে পদে বিপদ। বিচ্ছেদ আছে, মৃত্যু আছে, যন্ত্রণা আছে প্রতিদিনের সঙ্গী।

সেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ!

পুষ্পদন্ত কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বিপদের উপর বিপদ। পুষ্পদন্তের স্ত্রী জয়া এবং বন্ধু মাল্যবান যখন পুষ্পদন্তের হয়ে দুর্গার কাছে ক্ষমা চাইতে গেল তখন দেবী রেগে গিয়ে তাদেরও অভিশাপ দিলেন। পৃথিবীতে তারাও জন্মগ্রহণ করবে মানুষ হয়ে।

পুষ্পদন্ত জয়া আর মাল্যবানের সে কি কান্না!

দুর্গার মনটা একটু নরম হল।

তিনি বললেন, অভিশাপ যখন দিয়েছি ফিরিয়ে তো নেওয়া যাবে না। তবে একটা পথ আছে। পৃথিবীতে তোমরা জন্মগ্রহণ করে এই কাহিনী প্রচার করবে। কিন্তু সাবধান, সংস্কৃত প্রাকৃত বা কথ্যভাষায় কথাসরিৎসাগরের কাহিনী লিখবে না। তা যদি পার তবেই মুক্তি পাবে।

শর্ত মেনে নিল তিনজন।

অভিশাপ না যায় খণ্ডন। তিনজনই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে জন্মাল।

পৃথিবীতে পুষ্পদন্তের নাম হল গুণাঢ্য।

মোট সাত লক্ষ শ্লোকে গুণাঢ্য কথাসরিৎসাগরের কাহিনী লিখলেন। লিখলেন পৈশাচী ভাষায়। তাঁর আদেশে শিষ্যরা সেই বিরাট পুঁথি নিয়ে এল রাজা সাতবাহন বা শালিবাহনের কাছে।

রাজা তো তাদের দেখেই রেগে উঠেছেন।

বনে জঙ্গলে থাকে। পিশাচের মত দেখতে। যে পুঁথি নিয়ে এসেছে তা-ও পৈশাচী ভাষায় লেখা।

—যাও, বেরোও অসভ্যের দল।

রেগেমেগে তাদের তাড়িয়ে দিলেন সাতবাহন। গুরুর কাছে গিয়ে বলল তারা সব ঘটনা। বড় দুঃখ পেলেন গুণাঢ্য।

রাজা যখন এমন অবজ্ঞাভরে পুঁথি ফিরিয়ে দিলেন তখন এর প্রচার আর হবে না। মনের দুঃখে গুণাঢ্য ভাবলেন, এইসব লেখা এক এক করে পুড়িয়ে ফেলবেন তিনি।

পাহাড়ের নীচে জ্বালানো হল আগুনের কুণ্ড। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

গুণাঢ্য বসলেন একপাশে। হাতে তাঁর সাতলক্ষ শ্লোকের পুঁথি। পুঁথির এক একটা পাতা তিনি পড়েন, পড়া শেষ হলে এক একটা পাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেন আগুনে। সর্বভূক আগুন মুহূর্তের মধ্যে তাকে গ্রাস করে।

চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে শিষ্যরা। চোখে তাদের জল। এতদিনের শ্রম, অমন সুন্দর লেখা—সবই যাচ্ছে আগুনের পেটে। কিন্তু কি বলবে তারা! যে অপমান গুরু পেয়েছেন তা যে ভীষণ।

সেকালে রাজাই ছিলেন কবি-শিল্পীর আশ্রয়দাতা। সেই রাজাই তাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের।

এই পুঁথির আর মূল্য কি তাহলে?

দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল।

সুমধুর স্বরে গুণাঢ্য শ্লোক পড়েন। পড়া শেষ করে জলভরা অভিমানভরা চোখে এক একটা পাতা ছুঁড়ে ফেলেন আগুনে।

বনের পশুপাখীরাও এসে জুটেছে সেখানে।

খেলা ভুলে, খাওয়া ভুলে, গান ভুলে তারাও আগুনের চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের দুঃখে তারাও দুঃখী।

ইতিমধ্যে রাজা সাতবাহন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বৈদ্য বলল, মহারাজ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

রাজা বলেন, সে কি! আমি তো রোজ মাংস খাই। মাংসই সবচেয়ে পুষ্টি জোগায়।

বৈদ্য বলে, তা জানি না। তবে কোথায় যেন গোলমাল আছে।

রাজা ডাকলেন সূপকারকে।

সে কিছু বলতে পারল না।

মাংস যারা দেয়, ডাকা হল সেই ব্যাধদের। তাদের মুখেই শোনা গেল সব কথা। পুষ্টি হবে কি করে? বনের পশুপাখীরাই যে অপুষ্ট। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তারা জলভরা চোখে শুনছে এক সাধুর পুঁথি।

অবাক কাণ্ড তো!

রাজা নিজে বেরুলেন দেখতে।

ততদিনে গুণাঢ্য ছ' লক্ষ শ্লোক আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। বাকী আছে এক লক্ষ। শিষ্যরা বার বার বাধা দিচ্ছে। এক লক্ষ শ্লোক তারা আর কিছুতেই আগুনে পোড়াতে দেবে না।

রাজা সাতবাহন গুণাঢ্যের কাছে এসে পৌঁছালেন। শিষ্যদের দু' একজনকে দেখেই চিনলেন তিনি। আরে, সাত লক্ষ শ্লোক নিয়ে এরাই তো গিয়েছিল তাঁর কাছে! এই তবে তাদের গুরু! মুখখানার দিকে তাকালেই মনে কেমন এক ভক্তি ও ভালবাসা জন্মায়।

সত্যি ভুল করেছেন সাতবাহন।

তিনি গুণাঢ্যের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, বাকী এক লক্ষ শ্লোক দিন আমাকে। এর প্রচারের ভার আমার। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করব।

সাতবাহন গুণী রাজা। পন্ডিত।

সেই এক লক্ষ শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় লিখলেন তিনি। তার নাম দিলেন বৃহৎকথা। বৃহৎকথাই কালক্রমে কথাসরিৎসাগর নামে প্রচারিত হয়েছে।

এবার শোন কথাসরিৎসাগরের গল্প।

ফিরে এল বিজয়দত্ত

কালিন্দী নদীর তীরে বাস করত গোবিন্দস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণটি ছিল সৎ এবং ধার্মিক। তার দুটি ছেলে, অশোকদত্ত এবং বিজয়দত্ত।

কালক্রমে সেই দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।

করাল তার ছায়া।

লোকালয় শূন্য হয়ে গেল। খেতে না পেয়ে মরল অনেক, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ গেল অনেকের। অনেকে আবার পালাল দেশ ছেড়ে।

গোবিন্দস্বামী তার স্ত্রীকে বলল, এখানে থাকার আর মানে হয় না। ভিক্ষাও মেলে না। কে কাকে ভিক্ষা দেবে। আত্মীয়স্বজনও দুর্দশাগ্রস্ত। চল আমরা দেশ ছেড়ে বারাণসীতে চলে যাই।

স্ত্রী রাজী হল।

বউ ছেলেকে নিয়ে গোবিন্দস্বামী দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বারাণসীর পথে। যেতে যেতে এক শিবভক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। সারা শরীর ভস্মমাখা, মাথায় জটা, নরমুণ্ড হাতে—দেখলেই ভয়ভক্তি জাগে একই সঙ্গে।

গোবিন্দস্বামী ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বলল, প্রভু ত্রিকালের কথা তো আপনি জানেন। ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কি হবে দয়া করে বলুন। দেশ ছেড়ে চলেছি অপরিচিত জায়গায়। মনে ভয় জেগেছে। ভবিষ্যতের কথা জানতে ইচ্ছে হয়।

সন্ন্যাসী বলল, শেষ পর্যন্ত তোমার ভবিষ্যৎ শুভ। গোবিন্দস্বামীর মনে ভয় ঢুকল।

—প্রভু, 'শেষ পর্যন্ত' কথাটা বললেন কেন?

—তোমার ছোট ছেলে বিজয়দত্তের সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটবে। তবে শেষপর্যন্ত বড় ছেলে অশোকদত্ত তাকে খুঁজে বের করবে। আবার তোমাদের সকলের মিলন হবে।

এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেল।

ভয় শোক আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে গোবিন্দস্বামী বারাণসীতে এসে পেঁছাল। রাত্রি হয়ে গেল দেখে অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একটা গাছের তলায় সেদিনের মত আশ্রয় নিল। পথশ্রমে ক্লান্ত গোবিন্দস্বামী ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মৃদু গোঙানির শব্দে মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে গেল।

কে কাঁদে?

সে পাশে তাকিয়ে দেখল তারই ছোটছেলে বিজয়দত্ত জ্বরের কাঁপুনিতে কাৎরাচ্ছে। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে দেখল বিজয়স্বামী। নিজের গায়ের কাপড় খুলে তার উপর চাপাল। কিন্তু কিছুতেই শীত যায় না। বিজয়দত্ত বলে, বাবা, কাপড়ে এই শীত যাবার নয়। কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাও। তবে যদি হয় কিছুটা।

মহাসমস্যায় পড়ল গোবিন্দস্বামী।

এখন আগুন পায় কোথায়?

বিজয়দত্ত বলল, ঐ তো দূরে আগুনের কুণ্ড দেখা যাচ্ছে। সেখানেই নিয়ে চল। আমার শরীর কাঁপছে। বাবা, তাড়াতাড়ি চল।

গোবিন্দস্বামী জানে ঐ আগুনের কুণ্ড কিসের। সে ছেলেকে বোঝাতে চাইল, বাবা ওটা যে শ্মশান। দূর থেকে যে আগুন তুমি দেখছ তা যে চিতার আগুন। শ্মশানে কতরকম ভূতপ্রেতের বাস। ছোটছেলে তুমি সেখানে যাবে কি করে এই রাত্তিরে?

বিজয়দত্ত সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি কি কাপুরুষ? কি করবে

ভূতপ্রেত আমার? এক্ষুণি আমাকে নিয়ে চল সেখানে।

কি আর করে গোবিন্দস্বামী!

ছেলেকে নিয়ে এল শ্মশানে।

দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতা।

চারদিকে কালো অন্ধকারের মধ্যে লাল আগুনের শিখা ভয়ংকর দেখাচ্ছে। চিতার উপরে অস্পষ্টভাবে কাকে দেখা যায়? কে নর-মাংস খাচ্ছে? বোধহয় রাক্ষসদের রাজা।

বিজয়দত্ত নির্ভয়ে আগুনের তাপে দেহ উত্তপ্ত করতে লাগল।

চিতার দিকে নজর পড়ায় সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, চিতার মধ্যে গোল ধরনের জিনিসটা কি?

গোবিন্দস্বামী বলল, বাছা, আগুনে যে শব দগ্ধ হচ্ছে এ তারই কপাল।

বিজয়দত্ত ভয় না পেয়ে একটুকরো জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে সেই শবের কপাল খোঁচাতে লাগল। তারপর করল কি—হঠাৎ সেই লাঠির টুকরো দিয়ে শবের মাংস খানিকটা তুলে এনে মুখে দিল। ব্যস।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেল। নিশাচরের আচারে দীক্ষিত হয়ে সে রাক্ষসে পরিণত হল। কোত্থেকে হাতে তার এল খড়্গ, মুখের দু'পাশে গজাল বড় বড় ধারালো দাঁত। শবের মাথাটা সে খাচ্ছিল তখন, শেষ করে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। তারপর খড়্গ নিয়ে নিজের বাবাকেই তেড়ে এল। সেই সময় অদৃশ্য বাণী শোনা গেলঃ

> হে কপালস্ফোট, পিতাকে হত্যা করা উচিত নয়।
> তুমি এদিকে এস।

বাণী শোনামাত্রই কপালস্ফোট অর্থাৎ বিজয়দত্ত অদৃশ্য হয়ে কোথায় চলে গেল।

পুত্রের শোকে তার বাবা বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ পর শ্মশান থেকে একা সে ফিরে এল।

গোবিন্দস্বামীর দুঃখে অন্যান্য সকলে সহানুভূতি জানাল। শিবভক্ত সন্ন্যাসী তাকে বলেছিল হারানো ছেলের সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। সেই আশাতেই বুক বেঁধে রইল গোবিন্দস্বামী।

তাদের অবস্থা দেখে সেখানকার একজন ধনী বণিকের দয়া হল। সে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল তাদের।

কালক্রমে গোবিন্দস্বামীর বড় ছেলে অশোকদত্ত যুবক হয়ে উঠল। নানা বিদ্যা শিখল সে। বাহুযুদ্ধে সে খুবই পারদর্শিতা লাভ করল। তার সমকক্ষ কেউ রইল না। সেখানকার রাজাও শুনলেন কথাটা। মনে রাখলেন।

কিছুদিন পরে একটা উৎসব উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে বহু মল্লবীর জড়ো হল। দক্ষিণাপথ থেকে একজন বিখ্যাত মল্লবীরও এসে পৌঁছাল। সত্যি, তার দারুণ দক্ষতা। একে একে অন্যান্য সব মল্লবীরকে সে কুপোকাৎ করল। রাজা তখন ডেকে পাঠালেন অশোকদত্তকে।

মল্লযুদ্ধ শুরু হল।

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অশোকদত্তের মত একটা ছোট ছেলেকে দেখে মল্লবীরের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। বিদ্রূপের হাসি। অশোকদত্তের হাত ধরে সে যেই জাপটে ধরতে গেল অমনি অশোকদত্ত এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। সে আঘাত সহ্য না করতে পেরে মল্লবীর চিৎপাত হয়ে পড়ল মাটিতে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল সকলে।

জয়, অশোকদত্তের জয়।

রাজাও খুব খুশী।

অশোকদত্তকে ডেকে রাজা বললেন, তোমার বীরত্বে খুব খুশী হয়েছি। আমার পার্শ্বচর নিযুক্ত করলাম তোমাকে। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে তুমি।

রাজার প্রিয়পাত্র অশোকদত্তের আর কোন অভাব রইল না। তার সংসারের চেহেরাও ফিরল। ছেলের সৌভাগ্যে বাবাও আনন্দিত। মনের মধ্যে শুধু সেই দুঃখের কাঁটা, কবে আবার দেখা হবে ছোট ছেলে বিজয়দত্তের সঙ্গে।

সেদিন চতুর্দশীতিথি।

দেবতার পুজো দিতে রাজা গেলেন রাজধানী থেকে বহুদূরে এক মন্দিরে। সঙ্গে পার্শ্বচর অশোকদত্ত। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাঁরা যখন একটা শ্মশানের পাশ দিয়ে ফিরছিলেন সেই সময় একটা আর্তনাদ কানে এল। রাজা কান পেতে শুনলেন। কে যেন বলছেঃ

হে মহারাজ! আমার কোন দোষ নেই। তবু আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে শূলের উপর চাপিয়ে। আজ তিনদিন হয়ে গেল। তবু মৃত্যু হল না। উঃ কি যে কষ্ট! তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে। আমাকে একটু খাবার জল দেবেন রাজা!

রাজা যেমন সাহসী তেমনি দয়ালু।

সঙ্গে সঙ্গে অশোকদত্তকে বললেন, কারোকে বল একটু জল দিয়ে আসতে।

—এই রাতে শ্মশানে কে যাবে মহারাজ? অশোকদত্ত বলল, তার চেয়ে আমিই বরং যাচ্ছি জল নিয়ে। আপনি বাড়ি চলে যান। একটু বাদে আমি ফিরছি।

অশোকদত্ত চলল শ্মশানের দিকে।

ভীষণ অন্ধকার।

মাঝে মাঝে চিতার আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ভয় এবং অন্ধকারকে বাড়িয়ে তুলেছে। চারদিকে শেয়ালরা নরমাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। বীভৎস পরিবেশ।

—কে রাজার কাছে জল চেয়েছিল?—চিৎকার করে অশোকদত্ত জানতে চাইল।

শ্মশানের এক প্রান্ত থেকে উত্তর এল। ঃ আমি—আমিই জল চেয়েছিলাম।

অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। অশোকদত্ত স্বর অনুসরণ করে অনেক কষ্টে এসে পেঁছাল। একটু দূরে একটা চিতা জ্বলছিল। তারই ক্ষীণ আলোয় সে দেখল শূলে বিদ্ধ একটি মানুষ—আর শূলের তলায় অপরূপ এক সুন্দরী মেয়ে। যেমন তার রূপ তেমনি তার বেশভূষা। মেয়েটি আকুল হয়ে কাঁদছে।

অশোকদত্ত জানতে চাইল, মা, তুমি কে?

—আমি এই শূলবিদ্ধ মানুষটির অভাগা স্ত্রী। মেয়েটি বলতে লাগল, তার মৃত্যুর পর তার চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেব। আজ তিনদিন হয়ে গেল অথচ তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল না। সে এখনো বেঁচে আছে। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে। প্রায়ই সে জল খেতে চাইছে। কিন্তু শূল তো অনেক উঁচুতে। আমি তার নাগাল পাই কি করে?

অশোকদত্ত বলল, আমার হাতে জল আছে। রাজা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি এক কাজ কর। আমার কাঁধে ভর দিয়ে তুমি তোমার স্বামীকে জল দাও।

মেয়েটি রাজী হল।

সে অশোকদত্তের কাঁধে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে অশোকদত্ত অনুভব করল তার শরীরে বিন্দু বিন্দু জলের মত কি যেন পড়ছে। জল? অমন চটচটে কেন? চোখ টানটান করে ভালো করে দেখে বুঝল যে, জল নয় রক্ত। রক্ত? আশ্চর্য তো!

সে কোনরকমে ঘাড় উপরের দিকে ফেরাতেই অবাক হয়ে গেল।

সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

মেয়েটির হাতে ছুরি। সেই ছুরি দিয়ে সে শূলবিদ্ধ মানুষটির মাংস টুকরো টুকরো কেটে কেটে খাচ্ছে। রাক্ষসী তাহলে।

সুন্দরী মেয়ের ছদ্মবেশে একটি রাক্ষসী।

অশোকদত্তের কাঁধের উপর তার পা। অশোকদত্ত সঙ্গে সঙ্গে তার পা দুখানা ধরে মারল এক আছাড়। এক আছাড়েই যেন গুঁড়ো হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য!

হঠাৎ মেয়েটি তার পা ছাড়িয়ে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এত আচম্বিতে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল যে, অশোকদত্ত ভাবল বুঝি সে শ্মশানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিল।

কিন্তু স্বপ্ন তো নয়। তার হাতে এই তো রয়েছে একটা নূপুর। মেয়েটির পা ধরে টানার সময় একটা পায়ের নূপুর তার হাতে খুলে পড়েছে। অপরূপ নূপুর। মানুষের জগতে এমন নূপুর দেখা যায় না।

পরের দিন সকালে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল সে। নূপুরটা রাজাকে দিল। রাজা তার অসম সাহসে খুশী হলেন। তিনি রাজমহিষীকে দিলেন নূপুরটা। রাজমহিষীও অশোকদত্তকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁরই আগ্রহে রাজকন্যার সঙ্গে বীর অশোকদত্তের বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন বাদে রাজমহিষী রাজাকে বললেন, মহারাজ, অশোকদত্ত

যে নূপুরটি এনেছিল তেমনি আর একটা নূপুর আমাকে তৈরি করে দিন। তাহলে ব্যবহার করা যায়।

রাজা বললেন, সে কি আর সম্ভব?

—কেন?

—এ নূপুর মানুষের তৈরি নয়। ঠিক এমনি একটা নূপুর আর পাব কোথায়?

রাজমহিষীর মনে একটু ক্ষোভ থেকে গেল। রাজা দেখলেন। তিনি স্যাকরাদের ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই একবাক্যে বলে গেল, এরকম দ্বিতীয় একটি নূপুর তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজা মুষড়ে পড়লেন।

সব শুনে অশোকদত্ত বলল, ভাবনা কি মহারাজ? আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি এর জোড়া দ্বিতীয় নূপুরটি এনে দেব।

বীর অশোকদত্তের প্রতিজ্ঞায় রাজার মনে একটা আশা হলেও তাঁর অন্য চিন্তা দেখা গেল। অশোকদত্ত এখন আর বাইরের লোক নয়। তাঁদের জামাই। সে যদি কোন বিপদে পড়ে?

—না, না বাপু। কাজ নেই আর নূপুর এনে। রাত-ভিতে শ্মশানে যেতে হবে না।

অশোকদত্ত বলল, আমাকে বাধা দেবেন না মহারাজ। আপনি তো জানেন, একবার আমি যা প্রতিজ্ঞা করি তা পূরণ করার চেষ্টা করি। আপনি বরং আশীর্বাদ করুন।

রানীর কাছ থেকে সেই নূপুরটা নিয়ে অশোকদত্ত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাতে বেরিয়ে পড়ল সেই শ্মশানের উদ্দেশে। গতবার কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাতেই শ্মশানে ঐ ঘটনা ঘটেছিল। এবারেও ঘটতে পারে অনুমান করে সে ঐ দিনটি বেছে নিয়েছিল।

শ্মশানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে অনেক রাক্ষসকে দেখতে পেল। কাঁধের উপর মরা মানুষের মাংস ঝুলিয়ে তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই রাক্ষসী? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে কোথাও দেখতে পেল না অশোকদত্ত।

সোজা পথে হবে না, একটু বাঁকা পথ দরকার। সে ভাবল। গাছের উপর মড়া বাঁধা ছিল। গাছ থেকে নামিয়ে মড়াটা পিঠের

উপর ফেলে যেন মাংসওয়ালা সাজল। শ্মশানের মধ্যে চিৎকার করে ঘুরে বেড়াতে লাগলঃ শোন তোমরা, আমি মহামাংস বিক্রি করছি। কেনার হলে এই বেলা কিনে নাও।

মহামাংস হল মানুষের মাংস। ঐ রাক্ষসীর কাছে মহামাংস বড় প্রিয়। তাই এই চাল চালল অশোকদত্ত।

হ্যাঁ, ঠিক চাল।

একটু বাদে শ্মশানের এক ধার থেকে একটি মেয়ের গলা শোনা গেলঃ ওহে, এদিকে এস।

অশোকদত্ত এগিয়ে গিয়ে দেখল গাছের তলায় সখীদের সঙ্গে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে বসে রয়েছে। যেন শ্মশানরাজ্যের রানী সে।

রানী বলল, মাংসের দাম কি তোমার?

অশোকদত্ত সেই নূপুরটা দেখিয়ে বলল, এই রকম আর একটি নূপুর যে দিতে পারবে তাকেই শুধু আমি মহামাংস বিক্রি করব।

মেয়েটি হাসল।

বলল, বুঝেছি তুমিই সেই লোক। সেবার চতুর্দশীতিথির রাত্রে শ্মশানে যে মেয়েকে দেখেছিলে আমিই সেই মেয়ে। আমারই এক পায়ের নূপুর তোমার হাতে। বেশ, তোমাকে আর একটা নূপুর দেব—কিন্তু আমার কথামত কাজ করতে হবে।

অশোকদত্ত রাজী হল।

—তাহলে শোন।—মেয়েটি বলতে লাগল, হিমালয়ের চূড়ায় ত্রিঘন্ট নামে একটি নগর আছে। সেখানে বাস করতেন লম্বজিহ্ব নামে এক রাক্ষস রাজা। আমি বিদ্যুৎপ্রভা—তাঁরই স্ত্রী। আমি ইচ্ছামত রূপ পরিবর্তন করতে পারি।

অশোকদত্ত অবাক হয়ে শুনছে।

—আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। আমার মেয়ে জন্মাবার পরেই আমার স্বামী মহারাজা কপালস্ফোটের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান এবং নিহত হন। অবশ্য কপালস্ফোট বিবেচক রাজা। আমাদের রাজ্য তিনি কেড়ে নেন নি। বরং আরো আয় উপায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু এদিকে আমার মেয়েটি বড় হয়ে উঠেছে। এবার তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। সেদিন

রাজার সঙ্গে শ্মশানের পাশ দিয়ে তুমি যাচ্ছিলে, তোমাকে দেখেই আমার মন বলল আমার মেয়ের তুমিই উপযুক্ত স্বামী। তাই ছলনা করে তোমাকে ডেকে এনেছিলাম। তুমি যে আবার আসবে তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলাম একটা নূপুর নিতে দিয়ে।

বাবা, এতো রীতিমত ষড়যন্ত্র! অশোকদত্ত রাক্ষসীর কথা শুনে ভাবতে থাকে কি করবে।

—হ্যাঁ, তুমি আর একটা নূপুর পাবে। কিন্তু শর্ত হিসেবে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

রাক্ষসীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে!

কিন্তু উপায় কি! প্রতিজ্ঞা পালন করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

অতএব অশোকদত্তও রাজী হল।

রাক্ষসী মায়াবলে আকাশপথে তাকে নিয়ে এল ত্রিঘণ্ট নগরীতে। রাক্ষসকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন পরে বিদ্যুত-প্রভাকে সে শর্তের কথা মনে করিয়ে দিল।

বিদ্যুৎপ্রভা কথা রাখল। নূপুর তো দিলই, সঙ্গে দিল একটা সোনার পদ্মফুল। কিছুদিন বাদে ফিরে আসবে, স্ত্রীকে এই কথা দিয়ে একজোড়া নূপুর নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এল। পথে পড়ে সেই শ্মশান। সেখানে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করল। বিদ্যুৎপ্রভা বলে দিল, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতিথিতে আমি এখানে আসি। এইদিন এলে আমার দেখা পাবে।

নতুন শাশুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অশোকদত্ত রাজপ্রাসাদে এল।

তার অভিযানের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে আনন্দে সকলের মন ভরে গেল। রাজা তো নগরে উৎসবের আয়োজন শুরু করে দিলেন। বীর অশোকদত্তের সংবর্ধনা উৎসব।

উৎসবের দিন রাজপ্রাসাদ সাজল অপরূপ সাজে। দেবতার মন্দিরে এক রূপোর কলসীতে সোনার পদ্মফুল স্থাপন করা হল। রাজা বললেন, দেখ কি চমৎকার শোভা। আহা রে, আর একটা পদ্মফুল থাকলে ভাল হত। দুটো কলসী দুদিকে শোভা পেত।

সঙ্গে সঙ্গে অশোকদত্ত বলে উঠল, মহারাজা, আমি আপনার জন্য

আর একটা পদ্মফুল ঠিক এনে দেব।

রাজা বললেন, না বাপু আর দুঃসাহসের কাজ নেই। আমার পদ্মের আর দরকার নেই।

রাজা নিষেধ করলেন বটে, কিন্তু সে নিষেধ অশোকদত্ত যে শুনবে না তা জানতেন। একবার প্রতিজ্ঞা করলে অশোকদত্ত তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতে তাই অশোকদত্ত আবার বেরিয়ে পড়ল।

রাক্ষসী শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করে বলল, একটা সোনার পদ্মফুল দিয়েছিলেন, আর একটা দিতে হবে আমাকে।

বিদ্যুৎপ্রভা বলল, আমি আর পদ্মফুল পাব কোথায়? একটাই ছিল। তবে পথ আছে। কিন্তু বড় কঠিন কাজ। আমাদের মহারাজা কপালস্ফোটের বাগানের সরোবরে সোনার পদ্মফুল ফোটে। আমার স্বামীকে তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সরোবর থেকে পদ্মফুল তুলে আনা খুবই কঠিন কাজ।

অশোকদত্ত নাছোড়বান্দা।

—যত কঠিনই হোক, আমাকে একবার নিয়ে চলুন সেখানে। চেষ্টা করে দেখব।

কি আর করে বিদ্যুৎপ্রভা।

জামাইকে নিয়ে এল সেই সরোবরের কাছে। অশোকদত্ত দেখল শাশুড়ী মিথ্যে বলেনি। সোনার পদ্মফুলে ভরা সেই সরোবর পাহারা দিচ্ছে ভীষণ সব রাক্ষসেরা। প্রহরীদের অসতর্কতার সুযোগে অশোকদত্ত সরোবরে নেমে পড়ল। দ্রুত হাতে পদ্মফুল তুলছিল সে। প্রহরীরা দেখতে পেয়েই তেড়ে এল।

অশোকদত্তও বীর।

সামনা সামনি যুদ্ধে সে কয়েকজন রাক্ষসকে বধ করল। অন্যান্য রাক্ষসরা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কপালস্ফোটের কাছে খবর দিল। কৌতূহলী কপালস্ফোট এল দেখতে।

কিন্তু সরোবরে এ কে?

চোখ কচলে বার বার দেখল সে।

এ কে?

এ কে?

এ যে অশোকদত্ত। তার দাদা।

ছুটে গিয়ে অশোকদত্তকে জড়িয়ে ধরল সে। বলল, চিনতে পারছ না? আমি তোমার ভাই বিজয়দত্ত। শ্মশানে লাঠি দিয়ে শবের কপাল ফাটিয়েছিলাম বলে আমার নাম হয়েছে কপালস্ফোট। এতকাল আগের কথা ভুলে ছিলাম। তোমাকে দেখামাত্র সব মনে পড়ে গেল। মোহ দূর হল।

আসলে তারা সকলেই ছিল বিদ্যাধর।

অভিশাপে এই দশা।

সেই অভিশাপ থেকে আজ মুক্ত হল।

দুই ভাই ফিরে এল উজ্জয়িনীতে। সবার মনে আনন্দের বান ডাকল।

বাবা গোবিন্দস্বামী বলল, বিজয় তুমি কোথায় অদৃশ্য হলে সেদিন?

বিজয়দত্ত বলতে লাগল, সেদিন নরমাংস মুখে দিয়ে আমি রাক্ষস হলাম। তারপর কে যেন ডাকল। আমি শ্মশানের মধ্যে চলে এলাম। তখন আরো অনেক রাক্ষস আমাকে ঘিরে ধরল। তারাই আমার নাম দিল কপালস্ফোট। তারপর তারা আমাকে রাক্ষসরাজার কাছে নিয়ে এল। তিনি দেখে খুশী হয়ে আমাকে সেনাপতির পদ দিলেন। কিছুদিন বাদে রাক্ষসরাজা গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে আমাকেই সকলে রাজা করল।

উজ্জয়িনীর মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল অশোকদত্ত ও বিজয়দত্তের কথা। তাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা।

প্রতিদিন লোকেরা দেখতে আসতে লাগল তাদের।

ভাগ্যের প্রসাদ

ভাগ্যের প্রসাদে কত অসম্ভব-ই না সম্ভব হয়! পঙ্গু ব্যক্তি পাহাড় লঙ্ঘন করে, মূক যে সে হয়ে ওঠে বাচাল।

হরিশর্মাও এমনি ভাগ্যের প্রসাদ পেয়েছিল।

কোন এক গ্রামে বাস করত সে। লেখাপড়া জানত না কিছু, হাঘরে অবস্থা ছিল তার। অথচ ঘরে অনেকগুলি পোষ্য। উপার্জন করার মানুষ সে একা। কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারত না। দুঃখে তার চোখ ফেটে কান্না আসত। ভাবত, হা ভগবান! আমাকে এত কষ্ট দিয়ে দগ্ধাচ্ছ কেন!

সপরিবারে সে ভিক্ষা করে বেড়াত। ভিক্ষাতেও আর কি পাওয়া যায়! সবদিন সমান ভিক্ষাও তো মেলে না।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে সে এক শহরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে থাকতেন স্থূলদত্ত নামে এক সম্পন্ন গৃহস্থ। হরিশর্মা তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করল। স্থূলদত্ত রাজী হলেন। আশ্রয় মিলল।

হরিশর্মা নিজে পরিচারকের কাজ করতে লাগল, তার স্ত্রী হল পরিচারিকা আর ছেলেদের নিযুক্ত করা হল গৃহপালিত পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে।

আশ্রয় পেয়ে হরিশর্মার মনে স্বস্তি এসেছে। তবু মনের কোণে একটা কাঁটা খচখচ করে। ভৃত্য হয়ে বাস করছে সে। মানুষের সম্মান তো সে পায় না! কতদিন এমনি ভাগ্যের হাতে মার খাবে সে!

কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে এইসব সে ভাবত। মনটা উদাস হয়ে যেত। মনের মধ্যে কাঁটার খোঁচাটা বড় যন্ত্রণা দিত তাকে।

সেই যন্ত্রণা বেড়ে গেল স্থূলদত্তের মেয়ের বিয়ের দিন।

হরিশর্মা আশা করেছিল যে এই উৎসবে তারও ডাক পড়বে। পেটভরে ভালোমন্দ খেতে পাবে তারা। কিন্তু বড়লোকের উৎসবে তাদের ডাক পড়ল না। সবাই মেতে রইল আনন্দে, ফাঁক পড়ল শুধু তারা। ভৃত্য যে! প্রভুর সঙ্গে একই আসনে ভৃত্যের কি ডাক পড়ে! সুখাদ্যের ঘ্রাণে বাতাস ম ম করতে লাগল, বাতাসে বইল সুগন্ধের স্রোত। হরিশর্মারা দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল শুধু। কেউ তাদের ডাকলো না।

বেদনা থেকেই জ্বালার জন্ম।

হরিশর্মার মনে তেমনি এক জ্বালার জন্ম হল। সে মূর্খ ছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন ছিল না। সে মনে মনে ভাবল, আমি গরীব এবং

মূর্খ বলে আমাকে সকলে অসম্মান করছে। বেশ, আমি কৌশলে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব। ছলনা করে স্থূলদত্তকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমার অলৌকিক জ্ঞান আছে। ভূত-ভবিষ্যৎ আমার নখ-দর্পণে। তা হলেই সে আমাকে শ্রদ্ধা করবে।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।

বাড়িতে তখন সকলে উৎসবে মত্ত। হরিশর্মা গোপনে নতুন জামাই-এর ঘোড়াটা চুরি করে দূরে অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। আর স্ত্রীকে বলল, তুমি সুযোগমত স্থূলদত্তকে আমার অলৌকিক জ্ঞানের কথা বলবে। বলবে বিপদে পড়লে আমার যেন সাহায্য নেয়। তারই লাভ হবে।

এদিকে নতুন জামাইয়ের ঘোড়া না পাওয়ায় বাড়িতে সরোগোল পড়ে গেল। কি হল, কে চুরি করল ঘোড়া! নতুন জামাই-এর ঘোড়া! সব্বোনাশ, শ্বশুরের সম্মান যায়। স্থূলদত্ত মাথায় হাত দিলেন। এখন কি উপায়!

সুযোগ বুঝে হরিশর্মার স্ত্রী স্থূলদত্তের কাছে গিয়ে বলল, আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? আমার স্বামীকে ডাকুন না! তিনি তো ভূত ভবিষৎ বলতে পারেন। তাঁকে ডাকুন, ঠিক একটা পথ তিনি বলে দেবেন।

স্থূলদত্ত যেন অন্ধকারে আলোর শিখা দেখতে পেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হরিশর্মাকে ডেকে পাঠালেন। খুব সম্মান দেখালেন তাকে।

হরিশর্মা বুঝল ওষুধ ধরেছে। তবু একটু হুল ফোটাতে ছাড়ল না। বলল, কালকে বিয়ের উৎসবের সময় মশায়ের তো আমার কথা মনেও ছিল না। আজ বিপদে আমার কথা মনে পড়েছে বুঝি!

স্থূলদত্ত নিজের আচরণের কথা মনে করলেন। ভাবলেন, সত্যি অন্যায় হয়েছে খুব। তখন তিনি হরিশর্মাকে তোয়াজ করতে শুরু করলেন। বললেন, সত্যি অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর। বড় বিপদে পড়েছি। তুমি ছাড়া এ বিপদ থেকে কে আমাকে উদ্ধার করবে!

হরিশর্মা খড়ি পেতে গণনার ছলনা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর গম্ভীরমুখে বলল, এখান থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণদিকে আপনার

জামাই-এর ঘোড়া চোরেরা লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে গিয়ে সন্ধান করুন। তাড়াতাড়ি যান, না হলে চোরেরা তাকে আজ রাতের মধ্যে আরো দূরে নিয়ে চলে যেতে পারে।

লোকজন ছুটল দক্ষিণদিকে।

হ্যাঁ, পাওয়া গেল ঘোড়া। একটা গোপন জায়গায় কারা যেন বেঁধে রেখেছিল তাকে।

স্থূলদত্ত এবং আশপাশের মানুষেরা খুব খুশী। হরিশর্মার উপর তাদের ভক্তি বেড়ে গেল। বাব্বাঃ, এ তো যে সে মানুষ নয়! ত্রিকালজ্ঞ গুণী। দেখতে দেখতে শহর জুড়ে প্রচার হয়ে গেল তার নাম। সকলের মুখে মুখে ফেরে তার নাম।

বন্ধনদশা শেষ হল হরিশর্মার। আর সে ভৃত্য নয়। শহরের সম্মানিত মানুষদের একজন। সুখে সে বাস করতে লাগল।

কিছুদিন বাদে সেখানকার রাজার প্রাসাদ হতে অনেক মূল্যবান ধনরত্ন চুরি হল। চোরের হদিশ পাওয়া গেল না। রাজা হরিশর্মার অলৌকিক জ্ঞানের কথা শুনেছিলেন। তিনি তলব দিলেন তাকে।

হরিশর্মা পড়ল মহা ফাঁপরে। এখন সে কি করে! এবার বুঝি ফাঁস হয়ে যায় সব! সে এসে ছলনা করে বলল, মহারাজ, আমাকে আজ একটু সময় দিন। গণনা করি, তারপর কাল আপনাকে সব বলব।

হরিশর্মার অলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে রাজার মনে সন্দেহ ছিল। তিনি বললেন, বেশ তো, এই ঘরে থাক তুমি। গণনা কর আজ সারা রাত। কালকে বলবে।

আসলে হরিশর্মাকে রাজা একটা ঘরে বন্দী করে রাখলেন আর কি। হরিশর্মা বুঝল, রাজা শেয়ানা। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে। কিন্তু হরিশর্মা কি শেষ রক্ষা করতে পারবে!

পারবে কি করে!

কোনদিকে কোন আলো তো দেখা যায় না। কৌশলে রাজা তাকে বন্দী করেছেন। নির্জন ঘরে বন্দী হরিশর্মা আকাশ-পাতাল ভাবে। নিজেকে ধিক্কার দেয়, মিথ্যা কথা বলার জন্য ধিক্কার দেয় নিজের জিহ্বাকে। বিড়বিড় করে বলে, রে জিহ্বা, সুখলাভের আশায় এ

তুই কি করেছিস! এখন যে মিথ্যার শাস্তি তোকে ভোগ করতে হবে।

হরিশর্মার বন্ধ ঘরের দরজার বাইরে কান পেতে ছিল একটি মেয়ে। সে ছিল রাজবাড়ির পরিচারিকা। তার নাম জিহ্বা। রাজবাড়ির ধনরত্ন চুরি করতে চোরদের সে সাহায্য করেছিল। ভেবেছিল কেউ বুঝতে পারবে না। তারপর হরিশর্মাকে ডাকা হতেই তার বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। শুনেছিল সে হরিশর্মার অলৌকিক জ্ঞানের কথা। তাই গভীর রাতে চুপি চুপি হরিশর্মার বন্ধ দরজার বাইরে কান পেতে ছিল সে। হরিশর্মা কি বলে, কি করে সে দেখতে চায়।

হরিশর্মা তখন বিড় বিড় করে বলছে, রে জিহ্বা, এ কি করেছিস তুই মিথ্যা সুখলাভের লোভে! এমন মিথ্যাচার!.........

জিহ্বা শুনল। শুনতে শুনতে ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগল। সে ভাবল, এই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ তাহলে সবই জেনে ফেলেছেন। আমার তো তাহলে বাঁচার আর উপায় নেই। এঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় কি!

ছিন্নমূল গাছের মত সে হরিশর্মার ঘরে ঢুকে আছড়ে পড়ল তার পায়ের উপর। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে বাঁচান মহাপুরুষ। আপনি সবই বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আমিই চোরের সাহায্যে ধনরত্ন চুরি করে প্রাসাদের পেছনে দাড়িম গাছের নিচে লুকিয়ে রেখেছি।

হরিশর্মা মনে মনে চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সংযত হল। নিজের চমক বাহিরে প্রকাশ করল না। জিহ্বা তাই কিছুই বুঝতে পারল না।

গম্ভীর হয়ে গর্বের ভান করে সে বলল জিহ্বাকে, যা, যা, এখান থেকে যা এখন। আমি ত্রিকালজ্ঞ। ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানি। হতভাগি, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিস বলে কারো কাছে তোর নাম বলব না। কিন্তু টাকাকড়ি যা চুরি করেছিস সব আমাকে দে। নাহলে রক্ষা নেই তোর।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিহ্বা বলল, হে মহাপুরুষ, দাড়িম গাছের নিচে সব পোঁতা আছে। সব আপনার। আমি কিছুই নেব না। প্রাণে বাঁচলাম এই ঢের।

প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল জিহ্বা।

ভাগ্যের প্রসাদে হরিশর্মা আবার বেঁচে গেল। পরের দিন সকালে রাজার লোকেরা যখন তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল সে তখন গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ মহারাজ গণনার ফল পেয়েছি। আমি আপনার ধনরত্ন উদ্ধার করে দিতে পারি।

অবাক সকলে। রাজাও অবাক।

রাজা আর তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে হরিশর্মা এল প্রাসাদের পেছনে, দাড়িম গাছের নিচে। তার নির্দেশে যখন মাটি খোঁড়া হল তখন একে একে হৃত ধনরত্ন পাওয়া গেল।

সন্দেহ দূর হল রাজার। খুব খুশী হয়ে হরিশর্মাকে তিনি গ্রাম দান করবেন বলে ঠিক করলেন। রাজার এক মন্ত্রী ছিল। দেবজ্ঞানী তাঁর নাম। তাঁর মনে কিন্তু হরিশর্মার অলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ শাস্ত্রাদি না পড়ে এই হরিশর্মা কি করে অলৌকিক জ্ঞান লাভ করল! আমার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় যে চোরেদের সঙ্গে এর কোন যোগসাজস আছে। তাই সে লুকিয়ে রাখা ধনরত্নের হদিশ জানতে পেরেছে। হরিশর্মা সত্যই জ্ঞানী কিনা এ ব্যাপারে নতুন একটা পরীক্ষা করা হোক, এই আমার মত।

রাজা আর কি করেন, মন্ত্রীর কথাও তো ফেলতে পারেন না। অতএব নতুন একটা পরীক্ষার আয়োজন করা হল।

গোপনে একটা কলসীর মধ্যে ব্যাঙ ভরে রাখা হল। তারপর রাজা বন্ধ কলসীটা এনে হরিশর্মাকে বললেন, এর ভেতরে কি আছে যদি বলতে পার তবেই বুঝব তুমি সত্যকারের জ্ঞানী। না হলে বুঝতেই পারছ—

প্রমাদ গুনল হরিশর্মা।

বুঝল তার অন্তিম সময় উপস্থিত।

আর রক্ষা নেই।

মনের মধ্যে তার ঝড় বইছে। ছোটবেলায় একবার তার বাবা তাকে কৌতুক করে মণ্ডুক বলে ডেকেছিলেন। সে কথা মনে পড়ল। সে এখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে নিজেকে সেই নামে ডেকে বলে উঠল, রে মণ্ডুক, এই কলসী তোর উপযুক্ত স্থান হয়েছে। এতেই তোর মৃত্যু হবে।।

ভেক বা ব্যাঙকেই সাধুভাষায় বলে মণ্ডূক। হরিশর্মার মুখে 'মণ্ডূক' শব্দটা শুনে সকলে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে। সকলে বলতে লাগল, সত্যি ইনি মহাজ্ঞানী। কলসীর মধ্যে যে ব্যাঙ রয়েছে সে কথাও ইনি জ্ঞানবলে জানতে পেরেছেন।

রাজাও খুব খুশী।

হরিশর্মাকে তিনি অনেক উপহার দিলেন। দরিদ্র হরিশর্মা হল সামন্ত রাজা।

উপস্থিত বুদ্ধির বলে ভাগ্যের প্রসাদ লাভ করল হরিশর্মা।

শ্রীদত্তের দুঃসাহসিক অভিযান

মালবদেশে যজ্ঞসোম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ এবং পরোপকারী। সকলে ভালোবাসত তাঁকে। দুই ছেলে ছিল তাঁর—কালনেমী এবং বিগতভয়। ছেলে দুটিকে রাজ্যের সকলে ভালোবাসত তাদের গুণের জন্য। বাবা মারা যাবার পর দু'ভাই লেখাপড়া শেখার জন্য পাটলিপুত্রে গেল। গুরু তাদের ব্যবহারে এবং লেখাপড়া শেখার আগ্রহে খুব খুশী হলেন। লেখাপড়া শেষ হবার পর তিনি তাঁর দুই মেয়েকে দুই ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এরপর তারা দেশে ফিরে এল।

দিন যায়।

কালনেমী ক্রমশঃ বুঝতে পারল যে, তাদের সৌভাগ্য দেখে প্রতিবেশীরা হিংসা করতে শুরু করেছে। তারা তাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। সে তখন লক্ষ্মীদেবীর পূজা শুরু করল। তার পূজায় লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিলেনঃ 'তোমার এক মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মাবে এবং বহু সম্পদ তুমি লাভ করবে। কিন্তু তুমি আমার পূজায় পাপমনে মাংস দিয়ে হোম করেছ বলে মিথ্যা চুরির অপবাদে নিহত হবে।'

দেবীর বর মিথ্যা হবার নয়।

কালক্রমে কালনেমী বহু ধনসম্পদের অধিকারী হল। তার এক ছেলেও জন্মাল। বাবা ছেলের নাম রাখলেন শ্রীদত্ত। কেননা ছেলেই যে সৌভাগ্য এনেছে। শ্রীদত্ত ক্রমে ক্রমে বড় হল এবং ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বাহুযুদ্ধ ও অস্ত্রবিদ্যায় ভীষণ পারদর্শী হয়ে উঠল।

এদিকে কালনেমীর ভাই বিগতভয়ের বাড়ীতে হঠাৎ শোকের ছায়া নেমে এল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত একদিন হঠাৎ তার স্ত্রী মারা গেল সাপের কামড়ে। গভীর শোকে বিগতভয় দেশান্তরী হল। কালনেমী অনেক খোঁজ করল, কিন্তু বিগতভয়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

কালনেমীর ছেলে শ্রীদত্তকে সেই দেশের রাজা খুব পছন্দ করতেন। রাজার ছেলের নাম বিক্রমশক্তি। রাজা কালনেমীকে ডেকে বললেন, 'তোমার ছেলে আমার ছেলের সমবয়সী। বিক্রমশক্তির সঙ্গে তাকে বন্ধুত্বসূত্রে আবন্ধ করতে চাই। কি বল!'

কালনেমী রাজার কথা শুনে ঘাড় নাড়ে। এ ত আনন্দেরই কথা। শ্রীদত্ত গুণী ছেলে। যেমন তার বুদ্ধি তেমনি তার শক্তি। কালক্রমে আরো অনেকেই তার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবন্ধ হল। যেমন মহাবল, উপেন্দ্রবল, ব্যাঘ্রভট, নিষ্ঠুরক ইত্যাদি।

এইভাবে দিন যায়।

একদিন এইসব বন্ধুদের নিয়ে শ্রীদত্ত আনন্দ করার জন্য গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হল। রাজপুত্র বিক্রমশক্তিও সঙ্গে ছিল। বিক্রমশক্তি বলল, 'আয়, রাজা রাজা খেলি।' সে রাজার ছেলে, তাই খেলার রাজা হবারও অধিকার তার। তার অনুচরেরা তাকেই রাজা করল। এদিকে বিক্রমশক্তির বন্ধুরাও ভাবল, 'আমাদের শ্রীদত্ত কম কিসে! বুদ্ধিতে শক্তিতে বিক্রমশক্তির চেয়ে সে অনেক উঁচুতে। আমরা তাকেই রাজা করব।'

যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

পাতার মুকুট তৈরি করে, ফুলমালা গেঁথে শ্রীদত্তকে সেসব পরিয়ে দিয়ে তারা তাকে রাজা করল। খেলার রাজা।

এইদেখে রাজপুত্রের খুব হিংসে হল। সে ভাবল, 'শ্রীদত্ত কালক্রমে আমাকে হটিয়ে দিয়ে সত্যিকার রাজা হতে পারে। এখন থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাকে একেবারে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে

দিতে হবে।'

রাজপুত্রের মুখেচোখে মনের ভাব ফুটে উঠল। শ্রীদত্তের বন্ধুরা দেখল, বুঝতে পারল এবং ভয় পেল। শ্রীদত্তও বুঝতে পারল। তারা তখন ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

যেতে যেতে গঙ্গার বুকে তারা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। একটি সুন্দরী মেয়ে জলের তলায় ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে। তার মুখে-চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে জলের তলা থেকে কেউ যেন তার পা ধরে টানছে। বীর শ্রীদত্ত এই দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারল না। সে তার বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে জলে ঝাঁপ দিল। মেয়েটির কাছে গিয়ে তার মাথার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। কিন্তু কিছুই হল না তাতে। মেয়েটি ডুবতেই লাগল। শ্রীদত্ত ভাবল, তার চেয়েও বলশালী কেউ কি জলের তল থেকে মেয়েটিকে টানছে! কে সে! দেখতেই হবে সে কে? কেমন বলবান লোক! তাই শ্রীদত্তও মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় ডুব দিল।

ডুবতে ডুবতে অনেক দূর গিয়ে সে চমৎকার এক শিবমন্দির দেখতে পেল। কিন্তু সেখানে জনপ্রাণী কেউ নেই। মেয়েটি গেল কোথায়? শ্রীদত্ত শিবকে প্রণাম করে মন্দিরের পাশের বাগানে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখে সেই রূপসী মেয়েটি চলেছে শিবের পূজা করতে। পূজো শেষ করে মেয়েটি আবার ফিরে চলল। তার পেছন পেছন চলতে লাগল শ্রীদত্ত। তার ভীষণ কৌতূহল এখন। দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি পরিচিত জায়গাতেই রয়েছে। তাহলে কাল জলের তলায় ডোবার সময় তার মুখে-চোখে এমন আতঙ্ক ফুটে উঠছিল কেন!

মেয়েটি অবশেষে এক চমৎকার প্রাসাদে ঢুকল। এক অপরূপ কারুকার্যখচিত ঘরে ঢুকে বসল পালঙ্কের উপর। পরিচারিকারা তাকে সেবা করতে লাগল। শ্রীদত্তও ঘরের একটা কোণে গিয়ে বসল। কেউ যেন তাকে দেখেও দেখছে না।

কিন্তু এ কি!

হঠাৎ মেয়েটি গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল। কান্না দেখে শ্রীদত্ত হকচকিয়ে গেল। এমন বুকফাটা কান্না কেন! তার মনে

বেদনাও হল। সে এগিয়ে এসে সবিনয়ে বলল, 'সুন্দরি! আপনি কে! আপনার কিসের দুঃখ আমাকে বলুন। আমি আপনার দুঃখ দূর করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।'

মেয়েটি চোখ মুছে বলল, 'আমরা দৈত্যরাজ বলির বংশধর। আমি সবচেয়ে বড়, আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। আমাদের প্রপিতামহকে বিষ্ণু বন্দী করে রেখেছিলেন। তারপরে তিনি নিহত হন। তারপরে আমরা যে নগরে থাকতাম সেখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে যাতে আবার আমরা সেখানে ঢুকতে না পারি সেজন্য নগরের বাহিরে বিষ্ণু একটি সিংহকে পাহারায় রেখেছেন। সিংহটি আসলে এক অভিশপ্ত যক্ষ। কুবেরের অভিশাপেই সে সিংহ হয়েছে। কুবের তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন যে যদি কখনো কোন মানুষ লড়াইতে তাকে হারিয়ে দেয় তখনই সে অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।' বিদ্যুৎপ্রভা এরপর বলল, 'আপনি বীর। আপনি এই সিংহকে পরাজিত করতে পারবেন। সেইজন্য ছলনা করে এতদূর আপনাকে টেনে এনেছি। আপনি যদি সেই সিংহকে হারাতে পারেন তাহলে তার কাছ থেকে মৃগাঙ্ক নামে এক খড়্গ লাভ করবেন। এবং সেই খড়্গের প্রভাবে আপনি হবেন এক দিগ্বীজয়ী রাজা।'

যুদ্ধের কথা শুনে বীর শ্রীদত্তের রক্ত নেচে উঠল। পরের দিন সে নগরের বাহিরে সিংহের কাছে এল। বলশালী বিশাল সিংহ। কিন্তু শ্রীদত্তও কম বলশালী নয়। সে সিংহকে পরাজিত করে তাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করল এবং মৃগাঙ্গ নামে খড়্গ হাতে নিয়ে বিদ্যুৎপ্রভার কাছে এল।

বিদ্যুৎপ্রভা তার বীরত্বে দারুণ আনন্দিত। তার হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রভা বলল, 'এই আংটি সাধারণ আংটি নয়। এই আংটি বিষনাশক। সাপে কামড়ালে এই আংটির প্রভাবে বিষ নষ্ট হয়।'

শ্রীদত্ত বলল, 'তোমাদের ব্যবহারে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।'

বিদ্যুৎপ্রভা উত্তর দেয়, 'সে ত বেশ কথা। আপনি এখন স্নানাহার করুন। এই যে পুকুর দেখছেন এতে ডুব দিয়ে স্নান করে আসুন।'

তার কথায় ভুলে পুকুরে ডুব দিল শ্রীদত্ত। তারপর জল থেকে মাথা

তুলে সে তো তাজ্জব বনে গেল। এ কোথায় এল সে! এ যে সেই গঙ্গাতীর, যেখান থেকে সে ডুবন্ত মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়েছিল! শ্রীদত্ত মনে মনে বুঝল যে বিদ্যুৎপ্রভা তাকে ঠকিয়েছে। বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে সেই নগরে সে থাকুক এটা তারা নিশ্চয়ই চায় না।

যাইহোক, আর কিছু করার উপায় নেই। শ্রীদত্ত গঙ্গারতীরে বন্ধুদের রেখে গিয়েছিল। কই তারাও তো কোথাও কেউ নেই। হয়ত অপেক্ষা করে করে তারা চলে গিয়েছে। তীরে উঠে সে তাদের সন্ধান করতে লাগল। অনেকদূর গিয়ে বন্ধু নিষ্ঠুরককে দেখতে পেল। নিষ্ঠুরক সতর্কভাবে তাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি তো গঙ্গায় ডুবলে। তীরে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর একদিন গেল, দু'দিন গেল......আমরা ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে। আর বোধহয় তুমি ফিরবে না।......আমরা শোকে বিহ্বল হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলাম। তখনই একটা দৈববাণী শুনলাম যে তুমি আবার জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে। এরপর আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করে তাঁর কাছেই যাচ্ছিলাম। নগরে ঢোকার কিছুটা দূরেই আমরা একটা মারাত্মক খবর পেলাম। শুনলাম যে বাবা মারা যাওয়ার পর বিক্রমশক্তি রাজা হয়েছে। কিন্তু সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাকে ভুলতে পারে নি। আসলে সে যে তোমার ভয়ে ভীত। রাজা হয়েই সে সোজা তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমার সন্ধান করেছে। তোমার খবর তোমার বাবা তো কিছুই জানেন না। কিন্তু বিক্রমশক্তি সে কথা মানতে চায় নি। সে ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছে অর্থাৎ চুরি করেছে এই অপরাধে তোমার বাবাকে শূলে চাপিয়ে হত্যা করেছে। তারপর সে পাগলের মত তোমার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। পেলেই তোমাকে হত্যা করবে।'

নিষ্ঠুরকের কথা শুনে শ্রীদত্ত বিস্ময়ে হতবাক। তার বাবা নিহত হয়েছেন! মিথ্যা চুরির অপবাদে!

কিন্তু তখন কি করা যায়!

নিষ্ঠুরক বলল, 'বাহুশালী ইত্যাদি আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা উজ্জয়িনী নগরে গিয়েছে—আমাকে এখানে রেখে গিয়েছে তোমার

সঙ্গে দেখা করার জন্য। চল এখন আমরা তাদের কাছে যাই।'

পথে যেতে যেতে নিষ্ঠুরকের কাছে শ্রীদত্ত নিজের অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করছিল। যেতে যেতে তারা রাস্তার উপর একটি মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটি খুব কাঁদছিল। শ্রীদত্ত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে? কেনই বা কাঁদছেন?'

মেয়েটি বলল, 'আমি এক অবলা নারী। মালব দেশে যাব। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

শ্রীদত্ত তখন তাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল। পথে রাত্রি হওয়ায় তারা একটা ফাঁকা বাড়ীতে আশ্রয় নিল। রাত্রিবেলা কোন চাপা আর্তনাদে জেগে উঠে শ্রীদত্ত এক অদ্ভুত জিনিস দেখল। দেখল যে সেই মেয়েটি বন্ধু নিষ্ঠুরককে হত্যা করে আনন্দে তার মাংস খাচ্ছে। যাকে আশ্রয় দেওয়া হল সে এই কাণ্ড করছে! ভীষণ ক্রোধে শ্রীদত্ত মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ দিয়ে মেয়েটিকে বধ করতে উদ্যত হল। মেয়েটি তখন রাক্ষসীতে রূপান্তরিত হল। শ্রীদত্ত তার চুলের গোছা ধরে খড়্গ তুলল। পরমুহূর্তেই মেয়েটির রাক্ষসীবেশের পরিবর্তন ঘটল। সে এক সুন্দরী রমণীতে পরিণত হল। মেয়েটি সবিনয়ে বলল, 'হে বীর শ্রীদত্ত, আমাকে বধ করো না। আমাকে মুক্তি দাও। আমি রাক্ষসী নই। বিশ্বামিত্রের শাপে আমার এই দশা ঘটেছে। আমি শাপমুক্তির জন্য তাঁকে কাতর অনুরোধ করায় তিনি বলেছিলেন যে, যেদিন তুমি আমার কেশ আকর্ষণ করবে সেদিন শাপমুক্তি ঘটবে। আজ বহুকাল বাদে আমার শাপমুক্তি ঘটল। তোমার প্রতি আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার কাছে একটি বর চাও।'

তার কথা শুনে শ্রীদত্ত বলল, 'মা, যদি তুমি সত্যি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাক তাহলে আমার বন্ধুকে বাঁচিয়ে দাও। অন্য কোন বর আমি চাই না।'

তার বরে নিষ্ঠুরক আবার বেঁচে উঠল। পরের দিন সকালে তারা উজ্জয়িনী যাত্রা করল। বন্ধুরা তাদের দেখতে পেয়ে আনন্দিত হল।

ভোগভাগ্য

পশুর ভাষা নেই, বুদ্ধি নেই, চেতনা নেই—তাই সে নিজের সুখ, আর আরাম প্রার্থনা করতে জানে না। মানুষ প্রার্থনা করে। এমন কি ভগবানের কাছে মোক্ষ মুক্তির চাইতে মানুষ চায় পার্থিব সম্পদ। সে বলেঃ আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, যশ দাও, রূপ দাও।......

তা, এসব যে চায় মানুষ, কিসের জন্য চায়? চায় ভোগ করবে বলে।

কৃপণ মানুষ সম্পদ সঞ্চয় করে। সঞ্চয় করতে করতে একদিন সে মরে যায়। সম্পদ তার ভোগে লাগে না। এমন সম্পদে কাজ কি? ধনের জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যেই ধন সম্পদ। গল্পে আছে কৃপণের ধন নাকি যক্ষ আগলায়।

ভাগ্য ভাল, পৃথিবীতে কৃপণের সংখ্যা কম। ভোগী মানুষেরই সংখ্যা বেশী।

এই ভোগ আর সঞ্চয়—এর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক তা নিয়ে একবার যশোবর্মার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। হাতের সামনে সুযোগ—যে কোন একটা সে বেছে নিতে পারে। কিন্তু নেবে কোন্‌টা? সঞ্চয় করবে না ভোগ করবে?

যশোবর্মার কথাটা হঠাৎ এসে পড়ল। ভাবছ, কে এই যশোবর্মা, তাই না?

যশোবর্মা সামান্য এক ভৃত্য।

কৌতুকপুর নগরীতে সার্থকনামা নামে এক রাজা বাস করতেন। যশোবর্মা তাঁরই ভৃত্য। দাতা বলে রাজার খুব নাম ডাক ছিল। কারোকে ফেরাতেন না তিনি।

ফেরাতেন শুধু নিজের লোককেই।

ফেরাতেন যশোবর্মাকে।

সে কিছু চাইলেই বলতেন, আমি তো তোমাকে দান করতে চাই, কিন্তু ভগবান সূর্যদেব যে অনুমতি দেন না। আমি কি করব বল।

এই বলে সূর্যের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেন।

যশোবর্মা দুঃখ পেত।

কিন্তু বুদ্ধিমান সে। তাই হতাশ না হয়ে সুযোগের অপেক্ষা করত।

সেই সুযোগ এল অচিরেই।

একদিন সূর্যগ্রহণের সময় সে এল রাজার কাছে। রাজা তখন একজন প্রার্থীকে মূল্যবান কিছু দান করছিলেন। সে বলল, প্রভু যে সূর্যদেব অনুমতি দিলে আমাকে আপনি দান করবেন, সেই সূর্যদেব স্বয়ং শত্রুর কবলে পড়েছেন। এই সময় আমি আপনার কাছে কিছু দান চাই।

রাজা হাসলেন।

যশোবর্মার বুদ্ধি আছে।

তার বুদ্ধিতে খুশী হয়ে তিনি তাকে কাপড়চোপড় ধনরত্ন দান করলেন।

কিন্তু সামান্য দানে আর কতদিন চলে।

দানের ধন দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে গেল। সে তখন মনের দুঃখে বনের মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে এল। হয় সে দেবীর কাছে বর লাভ করে ভাগ্য ফেরাবে, নচেৎ আত্মহত্যা করবে। দুয়ের একটা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যশোবর্মা।

অনাহারে অনিদ্রায় কায়মনোবাক্যে যশোবর্মা তপস্যা শুরু করল।

দেবী তুষ্ট হলেন।

স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বললেন, বৎস, তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছি। তুমি এখন বর চাও। কি নেবে বলঃ ধনভাগ্য না ভোগভাগ্য!

এ আবার কেমন কথা!

ধনভাগ্য না ভোগভাগ্য—কোন্‌টা সে চাইবে! এ দুয়ের তফাৎ কি? সমস্যায় পড়ল যশোবর্মা।

দেবীকে বলল, ধনভাগ্য এবং ভোগভাগ্যের মধ্যে কি তফাৎ তা যে জানি না। দয়া করে বলুন আমাকে। জানান। বুঝতে দিন।

দেবী বললেন, বললে আর বুঝবে কি! তার চেয়ে বরং নিজে গিয়ে পরীক্ষা করে এস। দেখে এস। শিখে এস হাতে কলমে।

—কোথায় যাব?

—কেন, তোমার নিজের দেশে।

—নিজের দেশে?

—হ্যাঁ, সেখানে অর্থবর্মা আর ভোগবর্মা নামে দুই বণিক আছে জানো তো?

মনে পড়ল যশোবর্মার।

হ্যাঁ এই নামে দুজন বণিক আছে বটে। তার সঙ্গে আলাপ নেই। কিন্তু সে শুনেছে তাদের নাম।

দেবী বললেন, পালা করে দুজনের বাড়িতে যাও তুমি। তাদের জীবন দেখ। তারপর কোন্‌টা ঠিক বুঝবে। সেইমত বর চাইবে।

দেবীর আদেশমত যশোবর্মা প্রথমে গেল অর্থবর্মার বাড়ি। খুব নাম ডাক বণিক অর্থবর্মার। সকলেই বলে, হ্যাঁ প্রচুর ধনরত্ন আছে তার। অনেক অমূল্য রত্নের সন্ধান পাবে তার কাছে।

অর্থবর্মা লোক ভাল। অতিথিকে আদর করেই গ্রহণ করল। তার বাড়ির ভেতর মণিমুক্তা অলংকারের রাশ দেখে তাক্ লেগে গেল যশোবর্মার।

বেলা হলে খাওয়ার ডাক হল।

অতিথিকে নিয়েই খেতে বসল অর্থবর্মা। নানারকম সুখাদ্যের গন্ধে পেটের ভেতর চুঁই চুঁই করছিল, তাছাড়া অনেকদিন ভালমন্দ খাওয়াও হয় নি। গোগ্রাসে গিলতে লাগল যশোবর্মা।

কিছুক্ষণবাদে তার চোখ গেল অর্থবর্মার পাতের দিকে। কিছুই খাচ্ছেন না তিনি। যশোবর্মা বলল, কি মশাই, খাচ্ছেন না কেন? লজ্জা করবার কথা আমার। অতিথি, অপরিচিত। অথচ আমিই কিনা গোগ্রাসে গিলছি। আর দিব্যি, চুপচাপ বসে আছেন আপনি। কি ব্যাপার!

অর্থবমার মুখে করুণ হাসির রেখা ফুটল। সে বলল, আপনি অতিথি। অতিথির সম্মানে আমি আপনার সঙ্গে খেতে বসেছি। আপনার পাতে যা দেওয়া হয়েছে তার কিছু কিছু নিয়ে বসেছি। না হলে তা-ও বসতাম না। এ সব আমার পক্ষে বিষ।

—তার মানে?

—মানে? মানে আমি অসুস্থ। কোন কিছুই আমার হজম হয় না। জোর করে কিছু খেলে হয় বমি হয়, না হয় পেটে দারুণ যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়।

—তাই নাকি?

অর্থবর্মা বলল, অথচ দেখুন, অভাব আমার কিছুই নেই। টাকা কড়ি নেই গরীব দুঃখী লোক—তাই খেতে পাই না, সে আলাদা কথা; আমার কিন্তু থেকেও ভোগে লাগে না।

যশোবর্মা মনে মনে ভাবল, কাজ নেই এমন ধনে বাপু। আমার ধন অথচ আমিই পারব না ভোগ করতে—এ ধনে কাজ কি!

অর্থবর্মার বাড়িতে সে রাতটা থেকে গেল যশোবর্মা। রাতের বেলা সে একটা দারুণ স্বপ্ন দেখল। বীভৎস কদাকার দেখতে কয়েকজন লোক হাতে লাঠি নিয়ে যেন অর্থবর্মার ঘরে ঢুকল। লাঠি উঁচিয়ে ধরে চোখ গরম করে তারা অর্থবর্মাকে যেন বলল, তুমি আজ এতখানি খেলে কেন? শয়তান, তোমার জন্য খাবারের পরিমাণ তো নির্দিষ্ট আছে। আজ সে নিয়ম ভাঙলে কেন?

এই বলে অর্থবর্মাকে দমাদম লাঠিপেটা করতে লাগল তারা। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল তারা। শুধু তাই নয়, এরপর তারা আর একটা ভয়ংকর কান্ড করল। ছুরি দিয়ে পেট কাটল অর্থবর্মার। যেটুকু বেশী সে খেয়েছিল, সব টেনে বের করল। চীৎকার করে কাঁদতে লাগল অর্থবর্মা।

স্বপ্ন ভেঙে গেল।

কি একটা চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল যশোবর্মার। চোখ কচলে ভালো করে তাকিয়ে দেখল যে, অর্থবর্মা পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওঃ কি দারুণ কষ্ট লোকটার।

যশোবর্মা মনে মনে বলল, দরকার নেই বাবা আমার অর্থভাগ্য। তার চেহেরা তো দেখলাম। এমন ধনী মানুষ, কিন্তু নিজের ভোগে সামান্য কিছুও লাগে না।

দেবীর আদেশমত এরপর সে এল ভোগবর্মার বাড়িতে। এ বাড়িতে ধনরত্ন নেই বেশী। কিন্তু বড় পরিচ্ছন্ন। অল্প জিনিস, কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হয়েছে।

ভোগবর্মাও যশোবর্মাকে আপ্যায়ন করল আন্তরিকভাবে। স্ত্রীকে বলল, অতিথি এসেছেন। আজ জমকালো রান্না কর দেখি একটু।

স্ত্রী বলে, কিন্তু—

হাসতে হাসতে বলল ভোগবর্মা. কিন্তু টাকাকড়ির টানাটানি এই তো!

এ যেন কোন সমস্যাই নয়।

ভোগবর্মা হাতের একটা অলঙ্কার খুলে দিল। আপাততঃ এটা বিক্রি করেই চলুক ক'দিন।

অবাক যশোবর্মা।

ভোগবর্মা বলে, আরে মশাই, আমি থাকলে অলংকার আবার হবে। না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যদি মানুষই মরে যায় তাহলে অলংকার কার ভোগে লাগবে!

সেই সময়েই ইচ্ছাভরণ নামে একজন বন্ধু এল তার বাড়িতে। সে বলল, ভোগবর্মা আজ তোমার নেমতন্ন। কাল আমার বলতে মনে ছিল না। আমার বাড়িতে আজ ছোটখাট একটা উৎসব আছে।

ভোগবর্মা বলল, আজ তো ভাই যেতে পারছি না। আমার ঘরে অতিথি। তাঁকে ফেলে যাই কেমন করে?

ইচ্ছাভরণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি তো আচ্ছা লোক হে! তোমার অতিথি আমারও তো অতিথি হতে পারেন। অত ভাবার কি আছে? ওঁকে নিয়েই চল না আমার বাড়ি।

যশোবর্মাকে নিয়ে ভোগবর্মা এল ইচ্ছাভরণের বাড়ি। সেখানে দারুণ খাওয়া দাওয়া হল। হ্যাঁ খেতে পারে বটে ভোগবর্মা। নাম তার সার্থক। মনে মনে বলল যশোবর্মা।

রাতের বেলা আবার তারা ফিরে এল ভোগবর্মার বাড়ি। সকালের সুখাদ্য বকেয়া ছিল। রাতের বেলা সেগুলোর সদ্ব্যবহার হল।

রাতের খাওয়ার পর একটু পানীয় খাওয়ার অভ্যেস ভোগবর্মার। কিন্তু বাড়িতে পানীয় নেই। রাতও অনেক হয়েছে। কি আর করা যায়!—ঠিক আছে, ভোগবর্মা বলল, কাল ঠিক জোগাড় করে নেব। একটু দুঃখিত মনেই সে ঘুমোতে গেল।

রাতেরবেলা স্বপ্ন দেখল যশোবর্মা।

স্বপ্নে দেখল ভোগবর্মার ঘরে ঢুকল কয়েকটা মানুষ। তাদের পেছনে যে ছিল তার হাতে লাঠি। লাঠিধারী লোকটা লাঠি দিয়ে অন্যদের পেটাতে শুরু করল। আর বলল, ভোগবর্মার জন্য পানীয় এনে রাখিসনি কেন? আঁ? শয়তানের দল।

ঘুম ভেঙে গেল যশোবর্মার।

দেবীর কাছে সে এবার ফিরে যাবে। আর তার কোন প্রশ্ন নেই। অর্থবর্মা সে হতে চায় না। ভোগবর্মার জীবনই সে কামনা করে।

দেবীর কাছে ভোগের ভাগ্যই সে প্রার্থনা করল।

আসল রাজা নকল রাজা

বিলাসপুরের রাজার নাম বিলাসশীল। কমলপ্রভা তাঁর রানী।

রাজার রাজত্বে সুখে শান্তিতে ছিল প্রজারা। রাজাকে ভয়ভক্তি করত, প্রাণভরে ভালবাসত। রাজারও মনে কোন অশান্তি ছিল না।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে অশান্তির বীজ ঢুকে পড়ল।

একদিন কমলপ্রভা রাজার মাথা টিপে দিতে দিতে হঠাৎ বলে উঠলেন, ওমা এ কি গো? দেখি দেখি।

রাজা ভাবলেন কি-না জানি বুঝি!

কৌতূহলী হয়ে তিনি তাকালেন। রানী ততক্ষণে পটাশ করে একটা পাকা চুল তুলে ফেলেছেন। হাসছেন আর বলছেন, মা গো মা, তুমি বুড়ো হয়ে গেলে বুঝি!

কথাটা রাজার মনে লাগল।

বয়েসকেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ডরায়। যৌবন যেই যাই যাই করে মানুষ অমনি তাকে ধরে রাখার কত চেষ্টায় মাতে। বুড়ো হলেই তো শেষ, বুড়ো মানুষকে কেউ পাত্তা দেয় না, জঞ্জাল বলে ভাবে।

রানীর কথায় রাজা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। আমি তবে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি? একা একা বার বার আয়নায় দেখেন নিজের মুখ। এই তো চামড়া কুঁচকে পড়েছে, মাথায় মাঝে মাঝে সাদা রেখা।

খুব মুষড়ে পড়েন রাজা।

রাজকাজে মন নেই। কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। লোকে ভাবল, পাগলই হলেন বুঝি!

গোপনে গোপনে বৈদ্যদের ডেকে পাঠান। বয়সকে ধরে রাখার কোন উপায় কেউ জানে কিনা রাজা জানতে চান। বৈদ্যরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এ আবার কি কথা! বৈদ্য তো আর ভগবান নয়। পারে যদি ভগবানই পারে বয়সকে ধরে রাখতে। স্বর্গে নাকি জরা বার্ধক্য নেই। কিন্তু মানুষের সমাজে স্বর্গের সে নিয়ম খাটবে কেন? বৈদ্যরা তাই নীরব থাকে। কেউ কেউ পরিষ্কার বলে দেয়, না মহারাজ আমাদের সে বিদ্যা জানা নেই। ভগবানের নিয়মকে ভগবানই পাল্টাতে পারে আমরা নই।

রাজার এই খেয়ালের কথা বৈদ্যসমাজে ছড়িয়ে পড়ল। তরুণচন্দ্রও শুনল। শুনেই তার মনে হল, যাক্ বাবা, এতদিনে পেলাম একটা ভালো শিকার।

তড়িঘড়ি সে ছুটে এল বিলাসপুরে।

দেখা করল রাজার সঙ্গে। তখনো রাজা একেবারে হতাশ হন নি। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায় তেমনি রাজা তরুণচন্দ্রকেই অবলম্বন করলেন। ধূর্ত লোকের কথা আরো বেশী মিষ্টি হয়। তরুণচন্দ্রও গলায় অনেক মধু ঢেলে কথা বলতে লাগল।

বলল, মহারাজ, তৈরি করা খুব কঠিন ব্যাপার বটে, কিন্তু ওষুধটা আমি জানি। সে ওষুধ ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাবেন। একেবারে হাবা বুড়োও টাটকা চ্যাঙড়া ছেলে হয়ে উঠবে। সাদা চুল কালো হয়ে যাবে, টাকে চুল গজাবে, কোঁচকানো চামড়া টান টান হবে। যেন ম্যাজিক মহারাজ।

রাজা সিংহাসন থেকে উঠে বসলেন ধড়মড় করে।

—কি বললে? কি বললে?

—হ্যাঁ মহারাজ, হাতে হাতে ফল পাবেন।

—বয়েস কমে যাবে?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—আমার সাদা চুল কালো হবে আবার?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—আবার লাবণ্য ফিরে আসবে চেহারার?

—হ্যাঁ মহারাজ।

তরুণ হবার লোভে রাজার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। না হলে তিনি জগতের নিয়মের কথা ভাবতেন। বুঝতেন যে বয়স কমানো অসম্ভব। মরীচিকার পেছনে ছোটা বুদ্ধিমানের উচিত নয়। কিন্তু রাজা তখন অন্ধ। লোভ তাঁর দৃষ্টিকে অন্ধ করেছে।

মন্ত্রীদের কেউ কেউ সাহসী হয়ে বাধা দিল। বলল, মহারাজ এসব হল বদমাইশ লোকের ফাঁদ। এই ফাঁদে পা দেবেন না।

রাজা রেগে গেলেন। ভাবলেন, বুঝি হিংসেতেই মন্ত্রীরা জ্বলছে। তাঁর বয়স কমবে, তাদের বয়েস বেড়েই চলবে—তাই বুঝি হিংসে।

তিনি তাই ধমকে উঠলেন, বদমাইশ বলছ কাকে?

মন্ত্রীরা থমকে গেল।

রাজা বললেন, কত বড় বৈদ্য জান? আমি লোক চিনতে জানি। বেশী ওস্তাদি করতে এসো না।

কেউ আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না।

তরুণচন্দ্র এবার তার খেল্ শুরু করল। একটা আজেবাজে ওষুধ তৈরি করে বলল, মহারাজ এই ওষুধ গায়ে মেখে আপনাকে আট মাস অন্ধকার ঘরে থাকতে হবে।

—অন্ধকার ঘরে?

—হ্যাঁ। শুধু অন্ধকার ঘর নয়, মাটির নিচের ঘরে।

—বেশ, বেশ।

—আট মাস পরে সেখান থেকে একেবারে আনকোরা যুবক হয়ে বেরিয়ে আসবেন।

—বেশ।

—এবং সে ঘর ঢোকার অধিকার আমার ছাড়া আর কারোর থাকবে না।

—বেশ, সেইরকম হুকুম দিয়ে দেব।

মন্ত্রীদের ডেকে রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন।—দ্যাখ, এই আট মাস আমি মাটির তলার ঘরে বাস করব। আমাকে যেন কোনরকমে বিরক্ত করা চলবে না। কোন কারণে কখনোই যেন সেখানে কেউ না ঢোকে।

—আট মাস রাজ্য চলবে কি করে মহারাজ?

—তোমরা চালাবে। আটটা মাস তো মাত্র। যেমন তেমন করে চালাও। আমি ফিরে এসে আবার নতুন করে শুরু করব। নতুন উদ্যমে ঢেলে সাজাব। মনে মনে সব ফেঁদে রেখেছি।

হুকুম দিয়ে রাজা চলে গেলেন মাটির নিচের ঘরে। এদিকে তরুণচন্দ্র রাজা বিলাসশীলের সঙ্গে চেহারার মিল আছে এমনি এক যুবককে জোগাড় করল অনেক খুঁজে। এত তাড়াতাড়ি এমনি চেহারার এক মানুষ পাওয়া যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। কি চমৎকার মিল! এক নজরে মনে হয় এ বুঝি বিলাসশীলের যুবক বয়সের ছবি।

যুবকও উৎসাহী খুব।

তরুণচন্দ্র বলেছে তাকে রাজা করা হবে। রাজা হবার আনন্দে অন্য সব কিছু সে ভুলে আছে। তরুণচন্দ্রের পায়ে পায়ে চলে। এমন ভাব দেখায় যেন, আজীবন সে তরুণচন্দ্রের আজ্ঞাবাহক হয়ে থাকবে।

মাস ছয়েক পরের কথা।

এক গভীর রাতে তরুণচন্দ্র প্রস্তুত হল। হাতে তার খড়্গ। উত্তেজক পানীয়ে মনের শেষ দুর্বলতা কাটিয়ে সে ঢুকল গিয়ে মাটির নিচের ঘরে। সেখানে তখন গাঢ় অন্ধকার। উত্তেজনায় বিলাসশীলের চোখে কিন্তু ঘুম নেই।

—কে? কে?

—তোর যম।

রাজা অবাক। বৈদ্যের গলা না? কিন্তু এ কি সম্বোধন?

—আপনি তরুণচন্দ্র এসেছেন কি?

—হ্যাঁরে, এবার প্রস্তুত হ।

রাজা ভাবলেন বুঝি রসিকতা। অন্ধকারে নিজেকে তো দেখতে পাচ্ছেন না। ভাবলেন বোধহয় তিনি যুবক হয়ে উঠেছেন। তাই প্রস্তুত হবার কথা বলা হচ্ছে।

কিন্তু এ কি, এ কি!

ধারালো একটা অস্ত্রের স্পর্শ লাগলো না?

অন্ধকারে তরুণচন্দ্র এলোপাথাড়ি আক্রমণ শুরু করেছে। কতক্ষণ আর আত্মরক্ষা করবেন রাজা? একসময় প্রাণ দিতে হল তাঁকে।

রাতারাতি রাজার মৃতদেহকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে একটা অন্ধকূপে ছুঁড়ে ফেলে দিল তরুণচন্দ্র। তারপর সেই যুবকের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে নিয়ে এল মাটির নিচের সেই ঘরে। আনার সময় জিজ্ঞেস করল, আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম তোমাকে। এ রাজ্যের কেউ দেখেনি তো?

—না, না। বাইরে বেরুইনি আমি।

যুবককে মাটির ঘরে নিয়ে এসে তরুণচন্দ্র বলল, কালকে রাজা হবে তুমি। কিন্তু শপথ করতে হবে।

—কি শপথ?

—তুমি আজীবন আমার কথা শুনে চলবে।

শান্তভাবেই যুবক বলল, চলব বৈকি।

—সবসময় মনে রাখবে আমার জন্যই তুমি রাজা হলে।

যুবক বলল, তা তো মনে রাখতেই হবে।

পরের দিন সকালে তরুণচন্দ্র মন্ত্রীদের ডেকে ঘোষণা করে দিল, আজকে আমি রাজাকে বাইরে নিয়ে আসব।

মন্ত্রীরা থতমত খেল।

তারা ভেবেছিল তরুণচন্দ্র অসম্ভবকে সম্ভব করবে কেমন করে? সে ধাপ্পা দিচ্ছে।

এখন সেই তরুণচন্দ্রই কিনা বলছে আজ মাটির নিচের ঘর থেকে রাজাকে বাইরে নিয়ে আসবে?

—আজই নিয়ে আসব রাজাকে। সেই বুড়োহাবড়া রাজা নয়, একেবারে টাটকা তরুণ রাজা। আটমাস আর লাগল না। মাত্র ছমাসের মধ্যেই আমার ওষুধের ফল ফলেছে।

অবাক সকলে।

আরো অবাক হল তরুণচন্দ্রের সঙ্গে যুবক রাজাকে দেখে।

হ্যাঁ সেই রাজাই তো। বয়েসটা যা পাল্টেছে। মুখের আদল তো সেই রকমই আছে।

তরুণচন্দ্র কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবককে বাইরে এনে রাজকার্যে বসিয়ে দেয় নি। তরুণচন্দ্র জানত, যুবক অনভিজ্ঞ, রাজকার্য পরিচালনার জন্য তার শিক্ষার প্রয়োজন। সে মন্ত্রী বা অন্যান্য সকলের

রাগে তরুণচন্দ্র তোতলাতে শুরু করল,, আচ্ছা দেখব। নকল রাজাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ দেখবে বৈকি। শীগ্‌গিরই দেখাব তোমাকে।

সেই থেকে তরুণচন্দ্র প্রতিশোধের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মনে মনে তার যে একটু ভয় না হয়েছে তা নয়। নকল রাজার রাগহীন শান্তমুখ কেন? কথাগুলো সে বলল দারুণ দৃঢ়তার সঙ্গে। তবে কি ভেতরে অন্য কিছু ব্যাপার আছে? কি সেটা?

কয়েকদিন পরে রাজা অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তরুণচন্দ্রকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। বেড়াতে বেড়াতে তারা এল এক নদীর তীরে। নদীর দিকে তাকিয়ে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল ঃ আরে ওটা কি? পরামর্শের জন্য তাকে ডাকা হচ্ছে না। সে আহত হয়ে নকল রাজাকে একদিন গোপনে বলল, ব্যাপার কি? শপথটা ভুলে গেছ নাকি?

—কেন?

—তুমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছ। পরামর্শের জন্য আমাকে ডাকছ না। তুমি কি ভুলে গেছ যে, আমার জন্যই রাজা হয়েছ তুমি?

নকল রাজা শান্তভাবে বলল, কে যে কার জন্য কি হয় কে জানে? কি বললে? তোমার জন্য রাজা হয়েছি?

তরুণচন্দ্রের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, কি বললে? তোমার সন্দেহ আছে বুঝি?

নকল রাজা বলে, সন্দেহ কিছুমাত্র নেই। রাজা হয়েছি আমারই তপস্যার ফলে। তুমি যন্ত্র মাত্র।

মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে বলল, আরো দুমাস কিন্তু মহারাজকে মাটির নিচের ঘরে থাকতে হবে। ওষুধের পুরো ক্রিয়াটা হওয়া দরকার।

সকলে তার কথা মেনে নিল।

পরদিন থেকে সেই যুবকের শিক্ষা শুরু হল। এবং নির্দিষ্ট দিনে তাকে বাইরে আনল তরুণচন্দ্র। যুবক রাজা হল।

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তরুণচন্দ্রকে নানা উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হল।

ক্রমে ক্রমে তরুণচন্দ্র দেখতে পেল যে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে।

নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে এক অপরূপ জিনিস। সোনার পদ্মফুল।

রাজার আদেশে একজন পরিচারক নদী সাঁতরে সংগ্রহ করে আনল সেই পদ্ম। এমন জিনিস সত্যি আর কখনো দেখেনি কেউ।

রাজার খেয়াল—

তরুণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রাজা বলল, তুমিই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তুমি পারবে। স্রোতের গতি লক্ষ্য করে তুমি জেনে এস কোত্থেকে আসছে এই পদ্মফুল।

মনে মনে রাজার মুণ্ডপাত করল তরুণচন্দ্র। কিন্তু উপায় নেই আদেশ লঙ্ঘন করার। নিজের মৃত্যুফাঁদ সে যে নিজেই তৈরি করেছে।

তরুণচন্দ্র নদীর স্রোত যেদিকে বইছে তার বিপরীত দিকে এগুতে লাগল। অনেক দূর গিয়ে সে একটা শিবমন্দির দেখতে পেল। পথশ্রমে সে তখন ক্লান্ত। ভাবল এখানে একটু বিশ্রাম করে নেবে। মন্দিরের পাশেই বটগাছ। নদীর গা বেয়েই উঠেছে গাছটা। আরে, গাছে ওটা কি? একটা নরকঙ্কাল।

ঠিক এমনি সময়ে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে পারলে মাথা বাঁচত। কিন্তু দরজা যে বন্ধ। মাথা বাঁচানোর জন্য তরুণচন্দ্র বট· গাছের গুঁড়ির নিচে আশ্রয় নিল।

জলের ঝাপটায় নরকঙ্কালটা দুলছে।

হঠাৎ নদীর জলের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তরুণচন্দ্রের। এই তো সোনার পদ্মফুল। এক দুই তিন চার......

এক এক ফোঁটা জল থেকে এক একটা পদ্ম।

জলের ফোঁটা.........

উপরে চোখ গেল। তখনই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কঙ্কালের উপর বৃষ্টির জল পড়ছে। সেই জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে নদীর জলে। সেই ফোঁটা থেকে দেখতে না দেখতেই জন্মাচ্ছে সোনার পদ্মফুল। এরজন্যই রাজা তাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু কিভাবে কি হচ্ছে তা কে বলে দেবে?

জনপ্রাণী চোখে পড়ে না।

কার কাছে জানবে?

অতএব বিলাসপুরে ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগে সে একটা মহৎ কাজ করল। নরকঙ্কালকে সে মুক্তি দিল। গাছের বাঁধন থেকে খুলে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

তারপর ফিরে এল বিলাসপুরে।

তাকে দেখে রাজা পাত্রমিত্রদের বিদায় দিল। বলল, এস, বস তরুণচন্দ্র।

শ্রমে, চিন্তায়, ভাবনায় তরুণচন্দ্র তখন উদ্‌ভ্রান্ত।

—তুমি জানতে পেরেছ?

—হ্যাঁ, সোনার পদ্মফুল কোত্থেকে জন্মায় তা জেনেছি। কিন্তু কেমন করে জন্মাচ্ছে তা জানতে পারিনি।

—কেমন করে পারবে? সেখানে লোক কোথায় যে জিজ্ঞেস করবে?

—তার মানে? উদ্‌ভ্রান্ত তরুণচন্দ্র এমন বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। রাজা জানল কি করে? তবে কি পেছনে পেছনে চর পাঠিয়েছিল?

—আ-আপনি মানে তুমি জানলে কি করে?

রাজা হাসছে। দেখে গা জ্বলে যায়।

রাজা বলছে, শিবমন্দিরের কাছে গিয়েছিলে তুমি। ভাগ্যবান। পবিত্র শিবমন্দির দেখেছ।

—তুমি, তুমি জানলে কেমন করে?

——বারে বা, জানব না?

—তবে শোন তরুণচন্দ্র। রাজা রহস্যের চাবি খুলতে শুরু করল ঃ যে কঙ্কাল তুমি জলে ভাসিয়ে পুণ্য লাভ করেছ, সে আমারই আগের জন্মের দেহ। আমি পূর্বজন্মে সেই শিবমন্দিরে তপস্যা করতে করতে দেহ ত্যাগ করেছিলাম। সেই তপস্যার ফলে আমি এ জন্মে জাতিস্মর হয়ে জন্মেছি, রাজাও হয়েছি। তোমার পূর্ব জন্মের কথা মনে নেই। শোন, পূর্বজন্মে তুমি আমার বন্ধু ছিলে। অজান্তে এ জন্মে বন্ধুর কাজই তুমি করেছ। এখন বুঝতে পারছ তোমার গর্ব বৃথা। আমার রাজা হওয়ার ব্যাপারে তুমি অচেতন হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছ মাত্র।

তরুণচন্দ্র স্তম্ভিত।

আর কি-ই বা তার বলার আছে?

রাজা কিন্তু অকৃতজ্ঞ হল না। পূর্বজন্মের বন্ধুকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করল।

জীমূতবাহনের কীর্তি

হিমবৎ পাহাড়ে ছিল বিদ্যাধরদের বাস।

বিদ্যাধরদের রাজার নাম জীমূতকেতু। জীমূতকেতুর ছেলেপিলে ছিল না। পুরুষানুক্রমে একটি কল্পতরু গাছ ছিল। সেই গাছের কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। জীমূতকেতু কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা জানালেন ঃ হে দেবতা, আমাকে একটি ছেলে দাও। সে যেন হয় ধার্মিক, হয় যেন গুণী।

দেবতা প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। দৈববাণী হল ঃ তোমার এক জাতিস্মর গুণী ছেলে জন্মাবে।

কিছুদিনের মধ্যে সফল হল দৈববাণী।

জীমূতকেতু ছেলের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। কালক্রমে জীমূতবাহন বড় হয়ে উঠলেন। যুবরাজ হলেন। চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। রাজপুত্রেরা সাধারণতঃ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে দিন কাটান। বিলাসব্যসনে মত্ত থাকেন। কিন্তু জীমূতবাহন তেমন নন। তিনি দয়ালু, সমব্যথী। দরিদ্রের বন্ধু তিনি। স্বার্থপর নন। অন্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটলে তাঁর মুখেও হাসি ফোটে।

এদিকে জীমূতকেতুর আত্মীয়জনেরা তলে তলে ঘোঁট পাকাচ্ছিল। ষড়যন্ত্র করছিল। এতদিন জীমূতকেতু তা জানতে পারেন নি। জানতে পারলেন যখন তখন সর্বনাশ অনেক দূর এগিয়েছে। তিনি রাগে দিশেহারা হলেন। যাদের এত উপকার তিনি করলেন তারাই নাকি এখন তাঁর রাজ্য কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করছে! চমৎকার! একেই বলে কৃতজ্ঞতা!

কিন্তু ছেলে জীমূতবাহন অন্য কথা বললেন। বললেন, কি লাভ বাবা আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে! রক্তপাত হবে। হিংসার আগুন আরো বাড়বে। ক্ষমতা, ধন সম্পদ তো চিরকাল থাকে না। এইসব ওরা চাচ্ছে। তা নিক না। চল ওসব ওদের দিয়ে আমরা বনে যাই।

জীমূতকেতু বলেন, আমিও সঙ্গে যাব তোমার। তুমি যখন যুবক হয়েও রাজ্য ত্যাগ করছ অবহেলায়, আমি বুড়োমানুষ, কদিনই বাঁচব, আমিও আর পড়ে থাকি কেন?

ছেলের সাথে বাবা রাজ্য ত্যাগ করে চলে এলেন মলয়পর্বতে। সেখানে চন্দনগাছে ভরা এক তপোবনে বাস করতে লাগলেন। সেই-খানেই জীমূতবাহনের সঙ্গে পরিচয় মিত্রাবসুর। কালক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

মিত্রাবসুর ছোট বোনের নাম মলয়াবতী।

একদিন মিত্রাবসু বললেন, বন্ধু আমার ছোট বোনকে তোমার হাতে দিতে চাই। তুমি আমার এই প্রার্থনা অপূর্ণ রেখো না।

জীমূতবাহন হাসছেন মিটিমিটি।

—কি ব্যাপার, তুমি হাসছ যে! মিত্রাবসু অবাক হন।

—আমি জানতাম।

—তার মানে?

—মলয়াবতীর সঙ্গে আমার যে বিয়ে হবে সে কথা জানতাম।

—জানতে? আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগেই জানতে?

—হ্যাঁ বন্ধু। আমি জাতিস্মর। আগের জন্মের কথা আমার মনে আছে। আগের জন্মেও তুমি আমার বন্ধু ছিলে। মলয়াবতী ছিল আমার স্ত্রী।

মিত্রাবসুর খুব কৌতূহল। বললেন, বল বন্ধু, আগের জন্মের গল্প একটু বল। তুমি তো জাতিস্মর, সব তোমার মনে আছে। আমি তো আর জাতিস্মর নই। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

মিত্রাবসুর অনুরোধে জীমূতবাহন পূর্বজন্মের কাহিনী বলতে শুরু করলেনঃ

"আগের জন্মেও আমি ছিলাম এক বিদ্যাধর। একদিন কোন এক কাজে দেবাদিদেব মহাদেব আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। তিনি

আমাকে অভিশাপ দেনঃ 'তুই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবি। এক বিদ্যাধরী তোর স্ত্রী হবে। নিজের ছেলেকে যখন তুই রাজা করবি তখনই তোর আগের জীবনের কথা মনে পড়বে।' দেবাদিদেবের কথা মিথ্যে হবার নয়। কিছুদিনের মধ্যে বল্লভীনগরে এক বণিকের ছেলে হয়ে জন্মালাম। আমার বাবা ছিল খুবই ধনী। আমার নাম হল বসুদত্ত। আমি যখন যুবক হলাম তখন বাবার আদেশে বাণিজ্যে বেরুলাম। পথের মধ্যে ঘটল মহাবিপদ। ডাকাতরা আমাদের ঘিরে ধরল। ধনসম্পত্তি লুঠপাঠ করল, বন্ধুবান্ধবকে হত্যা করল। আমাকে বেঁধে নিয়ে এল তাদের ইষ্টদেবী চণ্ডীর সামনে বলি দেবার জন্য। বলি দিতে হলে সর্দারের অনুমতি নিতে হয়। তারা এল আমাকে নিয়ে তাদের সর্দারের কাছে। আমাকে দেখামাত্রই সর্দারের মনের পরিবর্তন ঘটল। কি জানি হয়ে গেল। আমাকে হত্যা না করে, মুক্তি দিয়ে, সে দেবী চণ্ডীর সামনে নিজেকেই বলি দিতে উদ্যত হল। তখন দৈববাণী হলঃ 'বৎস, আত্মহত্যা করো না। আমি তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।' সেই সর্দার তখন বলল, 'দেবী আমার কোন অন্য বরের প্রয়োজন নেই। এই বণিকপুত্রের সঙ্গে আমার যেন জন্মজন্মান্তরে বন্ধুত্ব থাকে—এই বর চাই।' সেই বরই দিলেন দেবী। সেই থেকে সে আমার বন্ধু।

"তারপর আমি দেশে ফিরে এলাম। অনেকদিন বাদে আবার সেই সর্দারের সঙ্গে দেখা হল আমার। কিন্তু ভিন্ন অবস্থায়। একদিন দেখলাম তাকেই বাবার কাছে বেঁধে নিয়ে এসেছে আমাদের সৈন্যরা। বনের মধ্যে সে লুঠ করেছে কার ধন, এই তার অপরাধ। ছুটে গেলাম বাবার কাছে। বললাম সব। এই সর্দারই একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। বাবা তাকে মুক্তি দিলেন। আমার ঘরে তাকে সম্মানের সঙ্গে রাখলাম। সে আমাকে বলল, 'সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তোমাকে কি উপহার দেব? কৃতজ্ঞতার ঋণ কি করে শোধ করব তাই ভাবছি।' যাইহোক অনেকদিন থাকার পর সে চলে গেল। তার উপহার দেবার কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন বাদে সে আবার ফিরে এল। বলল, 'তোমার জন্য উপহার ঠিক করে এসেছি।' 'কি উপহার?' প্রশ্ন করলাম। সে তখন বলল, 'তোমার মত মহৎ লোকের যোগ্য স্ত্রী আমি

খুঁজে এসেছি। তুমি অনুমতি দিলে আমি সব ব্যবস্থা শুরু করব।' আমি তো অবাক। সে তখন বলল, 'তুমি আমার যে উপকার করেছ তাতে শুধু ধনরত্ন তোমায় উপহার দিতে আমার মন উঠল না। তোমার যোগ্য উপহার আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। একদিন হাতি শিকার করতে গিয়ে আমি হিমালয় পর্বতে গিয়েছিলাম। যেতে যেতে পথে দেখলাম চমৎকার এক সরোবর। তাতে অজস্র পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। মনে ভাবলাম, বুনো হাতিরা ঠিক এখানে জল খেতে আসবে। তাই গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। তারপর কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। সরোবরের এক তীরে ছিল এক মন্দির। সেই মন্দিরে দেখলাম এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। সিংহের উপর বসে রয়েছেন। দেবী দুর্গা যেন। মন্দিরটা শিবের। শিবপূজা করতে এসেছেন। তখনই আমার মনে হল ইনিই তোমার উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারেন। আমি দেখতে লাগলাম। ইতিমধ্যে তিনি সিংহের উপর থেকে নেমে সরোবরে নেমে পদ্মফুল তুলতে লাগলেন। আমি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনি অবাক। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে? এই দুর্গম জায়গায় আপনি এলেনই বা কেমন করে?' আমি আমার কথা সব বললাম। কৌশলে তোমার রূপগুণের কথাও জানালাম তাঁকে। তিনি কৌতূহলী হয়েছেন। তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

"তারপর আমাকে নিয়ে আমার সেই বন্ধু গেল সেই দুর্গম স্থানে। সেই মেয়ে সরোবরে আসতেই আমার বন্ধু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দেবী, আপনার উপযুক্ত স্বামী হবে মনে করে আমার সেই বন্ধুকে এনেছি।' আমাকে দেখে কিন্তু সেই মেয়ে কিছুতেই মানুষ বলে বিশ্বাস করতে চায় না। বন্ধুকে বলে, 'না, না, ইনি মানুষ নন, ইনি কোন দেবতা হবেন।' তখন আমি তার ভুল ভাঙালাম। বললাম যে, শিবের বরে আমি জন্মেছি। ভুল ভাঙল। সেই মেয়ে আমাকে স্বামী বলে বরণ করে নিল। সিংহের পিঠে চেপে আমি, সেই মেয়ে এবং আমার বন্ধু ফিরে এলাম বল্লভীনগরে। আমার বাবাও ভাবী পুত্রবধূকে দেখে খুব খুশী হলেন।

"বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বিয়ে যখন শেষ হল তখনই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দেখতে দেখতে সেই সিংহ মানুষের বেশ

ধারণ করল। আমরা সকলে অবাক। এ আবার কি রহস্য! সিংহবেশী মানুষটি তখন বলল, 'অবাক হবেন না। আমার কথা শুনুন।' সে বলে যেতে লাগল, 'আমার নাম চিত্রাঙ্গদ। আর এটি আমার মেয়ে মনোবতী। অভিশাপে আমার এই দশা হয়েছিল। একদিন মেয়েকে কোলে নিয়ে গঙ্গানদীর তীরে তপোবনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার গলার মালা ছিঁড়ে গিয়ে নদীতে পড়ে। নদীতে ছিলেন তখন নারদমুনি। মালাটা তাঁর পিঠে পড়ে। নারদমুনি রেগে উঠে আমাকে অভিশাপ দেন। এবং বলে দেন, 'যেদিন তোর মেয়ের সঙ্গে পৃথিবীর কোন মানুষের বিয়ে হবে, সেই বিয়ে তুই দেখবি, সেদিন কাটবে অভিশাপ।' আজ আমি অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। তোমরা সুখে থাক।' এই বলে বিদ্যাধর চিত্রাঙ্গদ অদৃশ্য হলেন।

"তারপর বাবার মৃত্যুর পর আমি রাজা হলাম। আমার বন্ধু আমার কাছেই থাকত। এত বড় বন্ধুকে দূরে রাখব কি করে? আমার একটি ছেলে হল। তার নাম রাখলাম হিরণ্যদত্ত। কালক্রমে আমি বুড়ো হলাম। হিরণ্যদত্তের হাতে রাজ্যের ভার তুলে দিয়ে বন্ধু এবং স্ত্রীকে নিয়ে কালঞ্জর পাহাড়ে চলে এলাম। সেখানেই হঠাৎ আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। আমি প্রার্থনা জানালাম, জন্মান্তরে যেন আমি এই স্ত্রী এবং এই বন্ধুকে স্ত্রী ও বন্ধুরূপে পাই।"

জীমূতবাহন পূর্বজন্মের কাহিনী শেষ করে বললেন, তাহলে বুঝতে পারছ কেন আমি বলেছিলাম যে মলয়াবতীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আসলে মলয়াবতী-ই আমার পূর্বজন্মের স্ত্রী, তুমি আমার পূর্বজন্মের বন্ধু। দেবতা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।

জীমূতবাহনের সঙ্গে মলয়াবতীর বিয়ে হয়ে গেল।

একদিন মিত্রাবসুকে নিয়ে জীমূতবাহন সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন।

—"হা বৎস, হা বৎস।"

কে কাঁদছে?

এমন বুকফাটা চিৎকার করছে কে?

তাঁরা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে একটি যুবক ছেলে তার মাকে

কি ব্যাপারে যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে। মা 'হা বৎস, হা বৎস' বলে বুকফাটা কান্না কাঁদছে।

দয়ালু জীমূতবাহন যুবকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কে? তোমার মা তোমার জন্য কাঁদছেন কেন?

যুবকটি তখন বলল তার কাহিনী।—অনেকদিন আগের কথা! কাশ্যপের দুই স্ত্রী ছিলেন। একজনের নাম কদ্রু আর একজনের নাম বিনতা। একদিন তাঁদের মধ্যে সামান্য একটা বিষয় নিয়ে ভীষণ ঝগড়া বেধে গেল। সূর্যদেবের ঘোড়াগুলোর গায়ের কি রঙ—এই নিয়ে ঝগড়া। কদ্রু বললেন, কালো। বিনতা বললেন, না সাদা। ঝগড়া দেখতে দেখতে ঘোরতর আকার ধারণ করল। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যিনি হারবেন তিনি অন্যের দাসী হবেন। কদ্রুর ছেলে সাপ, আর বিনতার ছেলের নাম গরুড়। জয়লাভের জন্য কদ্রু তাঁর ছেলেদের সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র করলেন। কদ্রুর ছেলে সাপেরা সূর্যের ঘোড়ার কাছে গিয়ে বিষ ছিটিয়ে দিল। সাপের দাঁতের গোড়ায় থাকে বিষের থলি। সেই বিষে সাদা ঘোড়াগুলো কালো হয়ে গেল। অতএব তর্কযুদ্ধে বিনতা হেরে গিয়ে কদ্রুর দাসী হলেন। বিনতার ছেলে গরুড় বিমাতার কাছে অনেক অনুরোধ করল মাকে দাসিবৃত্তি থেকে মুক্তি দেবার জন্য। কদ্রু কিছুতেই রাজী হলেন না। তবে কদ্রুর ছেলেরা মাকে বুঝিয়ে একটা সর্তে বিনতাকে মুক্তি দিতে চাইল। তারা বলল, দেখ গরুড়, তুমি বীর। একটা কাজ করতে পারলে তোমার মা মুক্তি পাবেন। দেবতারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করবেন। মন্থন করার সময় যে অমৃত উঠবে তা যদি তুমি আমাদের জন্য এনে দিতে পার তাহলে তোমার মা মুক্তি পাবেন। গরুড় অমৃত এনে দিতে রাজী হল। তার বীরত্বে ভগবান বিষ্ণু তাকে বললেন, তোমার উপর আমি তুষ্ট হয়েছি; কোন বর তুমি প্রার্থনা কর। গরুড় মায়ের অপমানে ভীষণ রেগে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, বর দিন সাপেরা যেন আমার খাদ্য হয়। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বললেন। গরুড় অমৃত লাভ করল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাকে বলে দিলেন, দেখ গরুড়, অমৃত নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু মূর্খ সাপেরা তা যেন না খায়। অমৃত খেলে জীব অমর হয়। সাপেরা যদি অমৃত খায় তাহলে এ জগৎ চিরকালের জন্য সাপের রাজত্বে পরিণত হবে। ইন্দ্র আবার

বললেন, তুমি অমৃত নিয়ে যাও, কিন্তু পুনরায় অক্ষত অবস্থায় তা যেন আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। অমৃত নিয়ে গরুড় চলে এল। অমৃতের হাঁড়ি হাতে করে দূর থেকে সে সাপেদের বলল, এই যে আমি অমৃত এনেছি। আমার মাকে এবার মুক্ত করে দাও। অমৃত দেখে সাপেদের খুব লোভ। কিন্তু কাছে তারা আসতে পারছে না ভয়ে। গরুড়কে যমের মত ভয় করে যে। গরুড় তখন হাঁড়িটা কুশগাছের পাতার উপর বসিয়ে বলল, এই রাখলাম। আমি মাকে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা এদিকে মনের সুখে অমৃত খাও। সাপেরা কুশপাতাশুদ্ধ হাঁড়িটা নিয়ে মহা আনন্দে চলল। তখন ইন্দ্র মায়াজালে হাঁড়িটা উধাও করে নিয়ে নিলেন। সাপেরা একসময় মাথা তুলে অবাক। এ কি ব্যাপার! কোথায় গেল হাঁড়ি! কি আর করে তারা, ভাবল কুশের উপর হয়তো দু'এক ফোঁটা অমৃত পড়ে থাকবে। জিভ দিয়ে তাই প্রাণপণে কুশপাতা-ই চাটতে লাগল। ধারালো কুশ। জিভ তাদের গেল দু' ফাঁক হয়ে। অতি লোভীদের এই রকমই শাস্তি হয়। এদিকে বিষ্ণুর বরে গরুড় তক্ষুণি সাপ খাওয়া শুরু করল। একটা খায় তো দশটা মারে। সাপেদের মধ্যে মহা আতঙ্ক। পৃথিবী কি সাপশূন্য হবে নাকি? সাপেরা তখন যুক্তি করল। সাপের রাজা বাসুকি গরুড়কে বলল, হে পক্ষীরাজ, সমুদ্রের তীরে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়ের চূড়োয় রোজ একটা করে সাপ রেখে আসা হবে। তাই তুমি খেয়ো। যথেচ্ছভাবে সাপের রাজ্য আক্রমণ করো না। গরুড় রাজী হল। প্রতিদিন একটি করে সাপ পাঠানো হতে লাগল। আমার নাম শঙ্খচূড়। আজ আমার দিন। আমাকে পাঠানো হয়েছে গরুড়ের খাওয়ার জন্য। তাই মা আমার কাঁদছেন।

শঙ্খচূড়ের মুখে এই কাহিনী শুনে জীমূতবাহন খুব ব্যথা পেলেন।

গরুড়ের এ কি রকম প্রতিহিংসা?

তাছাড়া, বাসুকিও বা কি রকম রাজা? সে এত স্বার্থপর কেন? গরুড়ের খাদ্য হয়ে প্রথমে তারই তো যাওয়া উচিত ছিল।

জীমূতবাহন মনে মনে আপনার কর্তব্য ঠিক করে নিলেন।

বললেন তিনি শঙ্খচূড়কে, তুমি হতাশ হয়ো না। আমার দেহ আজ তোমার বদলে গরুড়কে দেব। তোমাকে বাঁচাবো।

শঙ্খচূড় কিন্তু প্রবল প্রতিবাদ করল, এ কি কথা? এমন কথা আর বলবেন না। একটুকরো কাচের জন্য মূল্যবান মুক্তা কি নষ্ট করা উচিত? আমার জন্য আপনার জীবনদানও তেমনি অপাত্রে দান হবে। তাছাড়া আমার আত্মীয়বন্ধুরাও বা বলবে কি? বলবে ভীতু, কাপুরুষ। সে অপবাদ আমি সহ্য করতে পারব না।

জীমূতবাহনকে প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগল শঙ্খচূড়া। জীমূতবাহন কিন্তু মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার কথা পালন করব। কিন্তু মৃত্যুর আগে দেবতার উপাসনা করবে না তুমি?

মনে পড়ে গেল শঙ্খচূড়ের শিবপূজার কথা। সে দ্রুত চলে গেল সমুদ্রের তীরে গোকর্ণ নামে শিবমূর্তিকে পূজা করতে।

জীমূতবাহন মনে মনে প্রার্থনা জানালেন, আর যেন আসতে দেরী না হয় গরুড়ের। শঙ্খচূড় আসার আগেই এসে পড়ে যেন। বন্ধু মিত্রাবসুকেও তিনি কৌশলে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। রইলেন একা। কায়মনোবাক্যে গরুড়ের আগমন প্রার্থনা করতে লাগলেন।

হ্যাঁ, বীর গরুড় আসছে।

আকাশে-বাতাসে বীরের আগমনের সংকেত। সাঁই সাঁই শব্দ, বাতাসের ঘূর্ণিবেগ......সমস্ত আকাশ যেন অন্ধকার, পায়ের তলায় কাঁপছে মাটি......গরুড় আসছে।

তাড়াতাড়ি জীমূতবাহন সেই বধ্য শিলার উপর উঠে এলেন। এই শিলার উপরেই রোজ গরুড়ের জন্য খাবার আসে।

আকাশ অন্ধকার করে উন্মত্ত গরুড় এল। হিংসায়, প্রতিশোধের স্পৃহায় দৃষ্টি তার অন্ধ। জীমূতবাহনকে সে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলই না। ঠোঁটে করে তাঁকে তুলে নিয়ে সে উড়ে এল আরো উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায়। গরুড়ের ঠোঁটের আঘাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়তে লাগল জীমূতবাহনের শরীর থেকে। গরুড় শুরু করল খেতে......কিন্তু এ কি? খাওয়া শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে কেন? এ কি ব্যাপার?

এদিকে শঙ্খচূড় ফিরে এসে দেখে জায়গা ফাঁকা। নেই জীমূতবাহন। মাটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে সে দেখল বিন্দু বিন্দু রক্ত। তাহলে—

তাহলে গরুড় তাঁকে নিয়ে গেছে?

হায়, হায়, এই মহাপুরুষ আমার জন্য নিজেকে বলি দিয়েছেন। শঙ্খচূড় পাগলের মত ছুটতে লাগল। এতটুকু অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় নিয়ে গেল গরুড় তাঁকে?

গরুড় অবাক।

মনে মনে ভাবছে, যার আসার কথা সে-ই এসেছে তো! মৃত্যুর আগে মুখ শুকিয়ে যায় সকলেরই। কই, এর মুখের কোন বিকার দেখা যায় নি তো! ঠোঁট দিয়ে আঘাত করছি, যন্ত্রণায় একবারও তো উঠছে না ককিয়ে!

গরুড় যখন খাওয়া ছেড়ে অবাক হয়ে এইসব ভাবছে তখন জীমূত বাহন শান্ত গলায় বললেন, হে খগরাজ, আপনি চুপচাপ বসে আছেন কেন? আমার শরীরে এখনো রক্ত আর মাংস আছে। আপনারও পেটে খিদে আছে। আপনি তবুও চুপচাপ বসে আছেন কেন?

জীমূতবাহনের এই কথা শুনে গরুড়ের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা দূর হল। না, ইনি সে নয়।

—তুমি—আপনি কে?

জীমূতবাহনকে প্রশ্ন করে গরুড়।—বলুন কে আপনি? ক্ষত-বিক্ষত দেহে জীমূতবাহন বলেন, আমি সাপ। আমাকে ভক্ষণ করুন।

শান্ত স্বর জীমূতবাহনের।

—বলুন কে আপনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে। দয়া করে সন্দেহ দূর করুন।

চীৎকার করে বলছে গরুড়।

—হে খগরাজ, আপনি চুপ করে থাকবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি কোন রাগক্ষোভ নিয়ে বলছি না। আমাকে বিশ্বাস করুন।

ঠিক সেই সময় খোঁজ করতে করতে শঙ্খচূড় এসে হাজির। পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে উঠল, গরুড় থাম, থাম। তুমি ভুল করেছ। আমি শঙ্খচূড়, আমিই তোমার আজকের খাবার।

স্তম্ভিত হল গরুড়।

বুঝতে পারল সে।

জানতে পারল যাঁর গায়ে সে ঠোঁট বসিয়েছে তিনি এক মহাপ্রাণ মহাশয়।

অনুশোচনায় মন তার ভরে গেল। বলল, হায়, হায় এ কি দারুণ পাপ করেছি আমি। এ পাপের যে ক্ষমা নেই।

গরুড় তখন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে উদ্যত হল। কিন্তু জীমূতবাহন বাধা দিলেন। বললেন, পক্ষিরাজ, পাপের ভয়ে ভীত হয়েছেন? তাহলে আত্মহত্যা করে কি হবে? বরং আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে সাপকে আর হত্যা করবেন না। এবং যাদের হত্যা করেছেন তাদের স্বর্গের অমৃতে বাঁচিয়ে তুলবেন। এটাই প্রায়শ্চিত্যের একমাত্র রাস্তা।

গরুড় রাজী হল।

সাপের রাজ্যে ভয় দূর হল।

পরোপকারী জীমূতবাহনের কীর্তি অমর হয়ে রইল পৃথিবীতে। কবি তাই বলেছেন ঃ নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

মূষিক বণিকের কাহিনী

টাকাই টাকা আনে। এই হল পৃথিবীর পুরনো নিয়ম। কিন্তু কখনো কখনো বুদ্ধিবলেও টাকা আয় করা যায়।

যেমন করেছিল সেই বণিকটি।

শোন তার কাহিনী।

তার জন্মের আগেই তার বাবার মৃত্যু হয়। আত্মীয়-স্বজনরা ছিল ভারী দুষ্ট। তারা তার মায়ের ধনসম্পত্তি গ্রাস করে। তার মা ভাবলেন, এবার বুঝি সেই দুষ্টেরা তাঁর পেটের ছেলেরও ক্ষতি করবে। তিনি চলে এলেন তাঁর স্বামীর বন্ধু কুমারদত্তের বাড়ীতে। সেখানেই সে জন্মাল মা অনেক কষ্টে তাকে মানুষ করতে লাগলেন। একজন

উপাধ্যায়ের কাছে সে অক্ষর পরিচয় ও অঙ্কবিদ্যা শিখল। তারপর তার মা বললেন 'তুমি বণিকের ছেলে। এবার তুমি বাবার পেশা গ্রহণ কর। শোন, এই বিশাখিল রাজ্যে এক বণিক বাস করেন। তিনি মহাধনী। সৎ বংশের ছেলেদের তিনি টাকা ধার দিয়ে বড় হতে সাহায্য করেন। তুমি তাঁর কাছে যাও। তাঁকে তোমার সব কথা বল। তিনি ঠিক সাহায্য করবেন।'

মায়ের কথায় সে সেই মহাধনী বণিকের বাড়ীতে গেল।

সে যখন তাঁর বাড়ীতে পৌঁছাল তখন সেই বণিক বিশাখিল রাজ্যের এক বণিকের ছেলেকে খুব তিরস্কার করছিলেন। সে বুঝল যে, এই বণিকের ছেলেটিও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিল। মহাধনী বণিকটি খুব বিরক্ত হয়ে বলছিলেন, 'তুই একটা অপদার্থ। আবার এসেছিস সাহায্য চাইতে। এই সেদিন তোকে টাকা দিলাম। সেই টাকা দিয়ে কী টাকা বাড়িয়েছিস? আয় করেছিস কিছু? এমন কী মূলধনটাও সব জলে দিলি!'

কিছুদূরে একটা মরা ইঁদুর পড়েছিল। বণিক সেটা দেখিয়ে তাকে বললেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ, বুদ্ধি থাকলে এই মরা ইঁদুরটাকে দিয়েও টাকা আয় করা যায়।'

সে ইঁদুরটাকে দেখল। বণিকের কথা ভাবল। তারপর তাঁকে বলল, 'আমিও আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম। আমাকে নগদ টাকা দিতে হবে না। টাকার বদলে আমি এই মরা ইঁদুরটা নিয়ে গেলাম।'

সে ইঁদুরটাকে সত্যিই তুলে নিল। তারপর বণিককে প্রাপ্তি স্বীকারের একটা রসিদ লিখে দিল। মৃদু হেসে বণিক সেই রসিদটা বাক্সে রাখলেন। ইঁদুরটা নিয়ে সে চলে এল।

তারপর সে দু' মুঠো ছোলার বিনিময়ে একজন বণিকের কাছে তার বেড়ালের খাদ্য হিসেবে ইঁদুরটা বিক্রি করল। সেই ছোলা গুঁড়ো করে সে ছাতু তৈরি করল। তারপর ছাতু এবং এক কলসী জল নিয়ে শহরের বাহিরে গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করতে লাগল। কাঠুরিয়ারা সেই পথ দিয়ে আসবে। তাদের জন্যই অপেক্ষা। কিছুক্ষণ বাদে একজন কাঠুরিয়া এল। সে তাকে ভদ্রতাসহকারে ছাতু ও জল দিল। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত কাঠুরিয়া তো ভীষণ খুশী।

কাঠুরিয়া খুশী হয়ে তাকে দু' খন্ড কাঠ দিয়ে গেল। এইভাবে সে সেই কাঠ বিক্রি করে যে পয়সা পেত তার অর্দ্ধেকটা জমিয়ে রাখত, বাকী অর্দ্ধেকটা দিয়ে ছোলা কিনে ছাতু তৈরি করত। এবং ছাতু ও জল নিয়ে কাঠুরিয়াদের আসা-যাওয়ার পথের ধারে অপেক্ষা করত। এইভাবেই ধীরে ধীরে সে প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করল।

তারপর—

তারপর টাকা দিয়েই টাকা আনল। ধনবান বণিক হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল।

সে কিন্তু সেই ধনবান বণিকের কথা মনে রেখেছিল। তাঁর প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ। একদিন সে তাঁর সংগে দেখা করতে গেল। সংগে উপহার হিসেবে নিয়ে গেল একটা সোনার ইঁদুর। ইঁদুরই তো তার সৌভাগ্য এনেছিল। বিশাখিলের ধনবান বণিক তার কাহিনী শুনে সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলেন।

ইঁদুরকে সাধুভাষায় বলে মূষিক।

ইঁদুর বা মূষিককে অবলম্বন করে সে সৌভাগ্য লাভ করেছিল বলে তার নাম হল 'মূষিক বণিক'।

কীর্তিসেনার অভিযান

নাম ধনপালিত।

পাটলিপুত্রের বিখ্যাত বণিক।

নাম নিয়ে অনেক অনর্থ হয়। কানা ছেলের নাম রাখে পদ্মলোচন। কিন্তু ধনপালিতের নাম সার্থক। পাটলীপুত্রের ধনীদের মধ্যেও সে ছিল ধনী।

কীর্তিসেনা তারই মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী সে। যেমন রূপ তেমনি গুণ।

ধনপালিত তাকে মগধে নিয়ে এসে বিয়ে দিলেন দেবসেন নামে এক বণিকের সঙ্গে। কীর্তিসেনার উপযুক্ত স্বামী। সুপুরুষ, নীতিবান, গুণী। কিন্তু এমন স্বামী পেয়েও কীর্তিসেনার মনে আনন্দ নেই। কারণ, তার শাশুড়ী। কীর্তিসেনার সঙ্গে তিনি খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতেন, সুযোগ পেলেই নির্দয় হয়ে উঠতেন। দেবসেন কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গ জানত না। কীর্তিসেনা সঙ্কোচবশতঃ স্বামীকে এসব কিছু বলত না। সেকালে প্রায় সকল বধূকেই শাশুড়ী-ননদীর জ্বালা ভোগ করতে হত। কীর্তিসেনার ভাগ্য ছিল আরো খারাপ।

দেবসেন বণিক।

একদিন সে বাণিজ্যে বেরুবার তোড়জোড় করল। কীর্তিসেনা সে কথা শুনে খুব হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবল, তবু স্বামী ছিলেন, তার কিছুটা ভরসা ছিল। এবার তাকে একা পেয়ে শাশুড়ীর অত্যাচারের মাত্রা বাড়বে।

সঙ্কোচ কাটিয়ে সে স্বামীকে বলল, এতদিন তোমাকে কিছু বলি নি। আজ বাধ্য হয়ে বলছি। তুমি চলে যাচ্ছ আমাকে একা ফেলে। আমার বড় ভয় করছে।

দেবসেন অবাক।—সে কি কথা? মা রইল তো। ভয় কেন?

কীর্তিসেনা বলল, তোমাকে বলিনি এতদিন। তোমার মা আমার উপর ভীষণ অত্যাচার করেন।

—অত্যাচার?

—হ্যাঁ। সেইজন্য ভয় পাচ্ছি আমাকে একা ফেলে তুমি চলে গেলে সেই অত্যাচারের মাত্রা ভীষণ বেড়ে যাবে।

সেবসেন তার স্ত্রীকে চিনত। সে স্ত্রীর কথা অবিশ্বাস করল না। মায়ের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে। কিন্তু সে বুদ্ধিমান। ভাবল, এখন এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসা হলে তার অনুপস্থিতিতে মা কীর্তিসেনার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে। ফিরে এসে তখন যাহোক একটা ফয়সলা করা যাবে। মনের বিরক্তি চেপে সে মার কাছে গিয়ে বেশ কোমল গলায় বলল, মা আমি তো বাণিজ্য করতে বাইরে যাচ্ছি। কীর্তিসেনা রইল, তাকে একটু দেখো। বড় বংশের মেয়ে সে। তার মনে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

ছেলের কথায় তেতেমেতে উঠলেন মা।

বললেন, কি বলছ বাছা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বলছি চোখে চোখে রেখো। তার উপর যেন নির্দয় ব্যবহার না হয় সেদিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

মায়ের গলার স্বর চড়ল।—তার মানে তুই বলতে চাইছিস তোর বউ-এর উপর খারাপ ব্যবহার করি আমি? ডাক, ডাক তো তাকে। হতচ্ছাড়ী মায়ে-পোয়ে বিবাদ বাধাতে চাইছে। কথায় বলে না, ছেলে বিয়োলাম বউকে দিলাম আপনি হলাম বাঁদী। ডাক, ডাক তাকে।

কীর্তিসেনা এল।

মা চিনতেন বধূকে। সাত চড়েও তার মুখে রা বেরুবে না। গুরুজনকে কটুকথাও সে বলবে না। সেই সুযোগটাই মা নিলেন। গলা ছেড়ে বললেন, কই গো বউ, বল না কি অত্যাচার করি তোমার উপর। চুপ করে রইলে যে! বল বল।

কীর্তিসেনা নীরব।

দেবসেন সরল মনে ভাবল, বুঝি কীর্তিসেনা আঘাতের আশংকা করেই এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তার মনের উদ্বেগ অনেকটা দূর হল। সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল বলভীনগরীর দিকে।

অসহায় কীর্তিসেনা কিছু বলতে পারল না।

এইবার শাশুড়ী প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে ধীরে একটু একটু দগ্ধ করে প্রতিশোধ। কীর্তিসেনার সেবার জন্য যেসব দাসদাসী ছিল তাদের ছাঁটাই করা হল, কীর্তিসেনার খাবার কমিয়ে দেওয়া হল, ছেঁড়া পোশাক দেওয়া হল পরবার জন্য।

তারপর—

তারপর একদিন কীর্তিসেনাকে তার ঘর থেকে দাসীদের সাহায্যে টেনে এনে দারুণ প্রহার করা হল। মারতে মারতে শাশুড়ী বলতে লাগলেন, হারামজাদী তুই আমার ছেলেকে চুরি করেছিস। বলতে বলতে হাত, পা, দাঁত, নখ দিয়ে কীর্তিসেনাকে মারতে মারতে তাকে একটা অন্ধকার ঘরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাহির থেকে শেকল বন্ধ করে দিলেন।

এত আঘাত সহ্য করতে না পেরে কীর্তিসেনা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখল সে এক অন্ধকার ঘরে বন্দী। দরজায় সে মাথা ঠুকতে লাগল। কিন্তু বৃথা। দরজা খুলল না। একদিন গেল, দুদিন গেল। কীর্তিসেনা বুঝল শাশুড়ী চরম প্রতিশোধই নেবেন। তাকে এই বন্ধ ঘরে থেকে মরতে হবে।

হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছিল সে। সেই রকমই অভিপ্রায় ছিল শাশুড়ীর। ঠান্ডা মাথায় খুন করার অভিপ্রায়। মনে মনে ষড়যন্ত্র ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি। কিছুদিন বাদে পাড়াপড়শী যখন বউ-এর খোঁজ করবে তখন তাদের বলবেন তিনি, ছেলের অবর্তমানে বউ ভারী একটা অন্যায় কাজ করেছিল। সেই ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। ছেলে ফিরে এলে পাড়াপড়শীর কথা শুনে বিশ্বাস করবে।

এদিকে বন্ধ ঘরে কীর্তিসেনা মাথা ঠুকছে। হা ভগবান, এই ছিল আমার ভাগ্যে! বড় ঘরের মেয়ে আমি, অমন গুণবান স্বামী, কিন্তু শাশুড়ীর জন্যই আজ আমাকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। মেয়ে জন্ম হলে মা-বাবা এইজন্যই কাঁদেন। শাশুড়ী-ননদের অত্যাচারের কথা বিয়ের আগে শুনতাম। অতটা বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি। হা ভগবান, এ তুমি কি করলে? এইরকম বেঘোরে প্রাণ যাবে?

আছাড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তার পায়ে শক্ত কি একটা ঠেকল যেন। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কীর্তিসেনা জিনিসটা হাতে নিল।

খন্তা একটা।

খন্তা?

বিদ্যুতের মত তার মাথায় একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল। কথায় বলে না, ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো নিয়েও বাঁচতে চায়!

ঘরের পেছনের দিকে একটা বন্ধ জানালার নিচে সেই খন্তা দিয়ে সে মাটি খুঁড়তে লাগল। সুড়ঙ্গ করতে চায়। ক্ষিধেয় শরীর অবসন্ন, দুর্বল, তবু বাঁচার একটা উপায় পেয়ে মনে মত্ত হাতীর বল এসেছে। সব দুর্বলতা যন্ত্রণা ভুলে একমনে প্রাণপণে তন্ময় হয়ে কীর্তিসেনা মাটি খুঁড়ে চলল। বিফলে গেল না তার চেষ্টা। দুদিনের ক্রমাগত চেষ্টায় বাইরে বেরুবার ছোট একটা সুড়ঙ্গ তৈরি

হল। সেই ঘর থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে সে বাইরে বেরুতে গেল। কিন্তু এ কি!

এ তো আর একটা ঘর।

এক ঘরের সুড়ঙ্গ দিয়ে সে তার নিজের ঘরেই এসে পড়েছে যে!

ভাগ্যি ভালো, ঘরে কেউ নেই। এক কোণে ছোট একটা প্রদীপ জ্বলছে। কীর্তিসেনা দ্রুত হাতে কাজ সারতে লাগল। কিছু কাপড়চোপড় কিছু টাকাকড়ি গুছিয়ে নিল। তারপর অতি সংগোপনে বেরিয়ে এল বাইরে।

রাত দুপুর তখন।

নির্জন নিস্তব্ধ চারদিক। একটু ভয় ভয় করতে লাগল। কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে যে বেঁচে এল তার আবার ভয় কি! দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হচ্ছে কীর্তিসেনা। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলছে। কেউ দেখে ফেললেই বিপদ।

কিন্তু কোথায় সে যাবে?

বাপের বাড়ী?

একবার মনে হল সে কথা। কিন্তু সেখানে কেউ যদি তার কথা বিশ্বাস না করে! তাহলে আরো অপমান। না, সেখানে যাওয়া চলবে না। যেতে হবে বলভীনগরীর দিকে। যেখানে আছে তার স্বামী দেবসেন।

বলভীনগরী কোথায় কীর্তিসেনা চেনে না। অপরিচিত পথ। স্ত্রীলোকের পথে পথে বিপদ। তাই সে ছদ্মবেশ ধারণ করল। ধারণ করল পুরুষের বেশ। এখন তাকে এক কম বয়সী রাজকুমারের মত মনে হচ্ছে।

পথে যেতে যেতে আলাপ হল একজন বণিকের সঙ্গে। বণিকটি বলভীনগরীতে যাবে। বাঃ! ভালোই হল তবে। সঙ্গী পাওয়া গেল। বণিকের নাম সমুদ্রসেন।

সে সমুদ্রসেনকে বলল, আত্মীয়ের জ্বালায় অস্থির হয়েছি ভাই। বলভীতে আমার বন্ধুজনেরা আছে। তোমার সঙ্গে তাদের কাছে যেতে চাই। নেবে তো আমাকে সঙ্গে!

সমুদ্রসেন মানুষ ভালো। সে কীর্তিসেনাকে সঙ্গে নিতে রাজী হল।

লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে গেলে বণিকদের অনেক কর দিতে হত। তাই বণিকরা অনেকেই বনপথ দিয়ে যেত। সমুদ্রসেনও বনপথে সঙ্গীকে নিয়ে এগুতে লাগল।

যেতে যেতে সন্ধে হল।

হঠাৎ তারা শুনতে পেল একটা শেয়াল দারুণ চিৎকার করছে। নিশ্চয়ই কোন বিপদ আসছে। শেয়ালের চিৎকার তারই সংকেত। সমুদ্রসেন ভয় পেল। সঙ্গীসাথীদের বলল, তোমরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো। নিশ্চয়ই দস্যুদল আসছে। আমাদের আক্রমণ করবে।

কীর্তিসেনা ভয় পেল আরো বেশী।

পুরুষবেশে সজ্জিত হলেও সে তো আসলে মেয়ে। স্ত্রীলোক। বিপদ তারই বেশী। সে ভাবল, হায় হায়, একেই কি বলে ভাগ্যের ফের! একবার মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলাম। আবার এক মৃত্যু থাবা বাড়িয়ে এল। দস্যুরা যদি আমাকে এই বনের মধ্যে মেরে ফেলে তাহলে সে খবর জানতে পেরে রঙ চড়িয়ে আমার শাশুড়ী বলবেনঃ দেখ কেমন বউ! কেমন পাপী বউ! স্বামীর ঘর থেকে পালাতে গিয়ে প্রাণ হারালো। সকলে তখন অন্য কোন প্রমাণ না পেয়ে তাঁর কথাই বিশ্বাস করবে। আমার স্বামীরও ধারণা খারাপ হবে। এসব নিন্দা অপবাদ আমার কপালে জুটবে জেনেই মরতে হবে আমাকে? এই কি আমার কপালে লিখেছিলেন ভগবান? তবে কী সমুদ্রসেনকে ত্যাগ করে বনের মধ্যে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করব? কিন্তু বিপদের সময় বন্ধুকে ত্যাগ করা যে অধর্ম।

কীর্তিসেনার মনে এইভাবে ঝড় বইতে লাগল। কি করে সে এখন!

অবশেষে সে ঠিক করল যে সতীত্ব রক্ষাই তার কাছে প্রধান কর্তব্য। সেজন্য বন্ধু সমুদ্রসেনকে ত্যাগ করতে হবে। আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

অন্ধকারে পেছু হটে বনের মধ্যে সে আশ্রয় সন্ধান করতে লাগল।

মস্ত বড় একটা গাছের তলায় সে এসে পড়েছে। আরে এ কি! হাতড়ে হাতড়ে সে বুঝল গাছের কান্ডটা এক জায়গায় অনেকটা

ফাঁপা। এর ভেতরেই লুকিয়ে থাকা যায়। কীর্তিসেনা সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

একটুক্ষণ বাদেই মশালের আলো জ্বালিয়ে হৈ রৈ রৈ শব্দ করে এসে পড়ল দস্যুদল। হাতে তাদের ঝিকমিক করছে ধারালো অস্ত্র। সমুদ্রসেনের দল বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল না। কিন্তু দস্যুরা দলে ভারী। তাই তারাই জিতল। সমুদ্রসেন এবং তার সঙ্গীদের হত্যা করে, ধনরত্ন লুঠ করে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে দস্যুরা চলে গেল।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সব দেখল কীর্তিসেনা। আবার বন অন্ধকার হয়ে গেল।

এখন সে একা।

কোন্ একটা প্রাণীর ডাক শুনে বুকটা কেঁপে উঠল বুঝি। ঐ যে ওদিকে খসখস শব্দ কিসের? গাছের উপরদিকের ডালটা অমন নড়ে উঠল কেন?

ভয় পেল কীর্তিসেনা।

কিন্তু ভয়কে জয়ও করল।

একমনে ভাবতে লাগল স্বামীর কথা। মনকে দৃঢ় করে ভাবতে লাগল, হাল ছেড়ে দেব না। অসম্ভব বলে কিছু নেই। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি তা সিদ্ধ করবই।

কিন্তু বিপদ কীর্তিসেনাকে ছাড়ে না।

কে এগিয়ে আসছে ভাঁটার মত জ্বলন্ত দুটো চোখ নিয়ে! একটা বিরাট রাক্ষসী। সঙ্গে তার গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে। এই দিকেই আসছে যে! তবে কি এই রাক্ষসীর পেটেই যেতে হবে!

রাক্ষসী তার ছেলেদের নিয়ে গাছের ডালে চড়ে বসল।

কীর্তিসেনা প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল। গর্তের আরো খানিকটা ভেতরে ঢুকে এল নিঃশব্দে। কান খাড়া করে রইল।

রাক্ষসীর ছেলেরা বলল, মা আমাদের খেতে দে। বড় খিদে পেয়েছে।

তখন রাক্ষসী বলল, বাছারা, আজ নরমাংসের সন্ধানে আমি এক মহা শ্মশানে গিয়েছিলাম। সেখানে ডাকিনীদের অনেক অনুরোধ করলাম তাদের খাবারের কিছু ভাগ দিতে। তারা রাজী হল না।

তখন ভৈরবের কাছে খাবার প্রার্থনা করলাম। তিনি আমার নাম ও বংশপরিচয় জানতে চাইলেন। সে সব বলতে তিনি বললেন, তুমি সোজা চলে যাও বসুদত্তনগরীতে। বসুদত্ত নামে এক পরম ধার্মিক রাজা সেখানে বাস করে। সেই রাজার ভীষণ অসুখ। একদিন রাজা যখন মৃগয়ায় গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল সেই সময় একটা কানবিছা তার কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে মাথার ভেতরে আশ্রয় নেয়। সেই কানবিছা আরো অনেক কানবিছার জন্ম দেয়। কানবিছাগুলি রাজার রক্ত শুষে খায়। ফলে রাজা রক্তহীণ হয়ে খুব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। বৈদ্যরা কেউ তার রোগ ধরতে পারে নি। চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাই হয় নি। আর কিছুদিনের মধ্যে যদি চিকিৎসা না হয় তবে সে মারা যাবে। তার মাংসে তোমার ছমাস চলে যাবে।

রাক্ষসী বলল, বাছারা, ভৈরব এই কথা বলাতে আমি অপেক্ষা করে আছি। যতদিন না রাজা বসুদত্ত মারা যায় ততদিন অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। কি করি বল!

ছেলেরা তখন কৌতূহলী হয়ে রাক্ষসী-মাকে প্রশ্ন করল, রাজা কি বাঁচতে পারে? বাঁচার উপায় আর আছে কি?

রাক্ষসী বলল, আছে বটে, তবে খুবই কঠিন। কানবিছাগুলিকে বের করে দিতে পারলেই রাজা বেঁচে উঠবে।

একটি ছেলে প্রশ্ন করল, বিছাগুলিকে কিভাবে বের করবে?

রাক্ষসী বলল, প্রথমে রাজার মাথায় ভালো করে গরম ঘি মাখাতে হবে। তারপর সেই মাথা দুপুরবেলার রোদে রেখে কানের ভেতর বাঁশের লম্বা একটা নল ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই নলের আর একটা প্রান্ত থাকবে ঠান্ডা জলে ভর্তি কলসীর উপর। বিছাগুলি গরমে ক্লান্ত হয়ে মাথা থেকে কানের ভেতর দিয়ে বাঁশের নলের ভেতর এসে পৌঁছাবে ঠান্ডা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে। তারপর বাঁশের নলের ভেতর দিয়ে সোজা চলে আসবে কলসীর জলের ভেতর। তখনই রাজা সুস্থ হয়ে উঠবে।

কোটরের ভেতর কীর্তিসেনা শুনল সব কথা। একটা আলোর রেখা দেখে তার মন আনন্দে ভরে উঠল। সে ভাবল, যদি এ যাত্রা বেঁচে যাই তাহলে স্বামীর সঙ্গে হয়ত আমার দেখা হতে পারে। আমি বসুদত্তের অসুখ সারিয়ে তুলব এবং তাঁর সাহায্যে স্বামীর

সঙ্গে আমার দেখা হবে।

নিঃশব্দে কীর্তিসেনা অপেক্ষা করে রইল। একসময় পূবদিকে আলোর রেখা দেখা দিল। রাক্ষসী আর তার ছেলেরাও সেই গাছ থেকে নেমে আরো গভীর বনের ভেতর ঢুকে গেল। গাছের কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল কীর্তিসেনা। পরনে তার সেই পুরুষের বেশ। বন থেকে বাইরে লোকালয়ের মধ্যে চলে এল।

ভোর সকালে এক রাখাল যাচ্ছিল পথ দিয়ে। তাকে কীর্তিসেনা প্রশ্ন করল, ভাই হে, সামনে ওটা কোন্ দেশ?

সে বলল, ঐ তো বসুদত্তনগরী।

কীর্তিসেনার মন আনন্দে ভরে উঠল।

—বসুদত্ত এই রাজ্যের রাজার নাম তো?—কীর্তিসেনা সন্দেহ দূর করতে চাইলো নিজের।

—হ্যাঁ। রাখালের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। সে আবার বলল, রাজার বড় অসুখ হে। কেউ কিছু করতে পারছে না। আমাদের প্রিয় রাজা এখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন।

কীর্তিসেনা বলল, আমাকে যদি নিয়ে যেতে পার সেখানে, আমি তাহলে রাজার রোগ সারিয়ে দেব।

রাখাল উৎসাহিত।—সারিয়ে দেবে রাজার রোগ! চল চল এখুনি চল। আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।

পুরুষবেশী কীর্তিসেনাকে নিয়ে রাখাল এল রাজা বসুদত্তের প্রাসাদে। রাজা শুনলেন রাখালের কথা। একদৃষ্টে দেখলেন কীর্তিসেনাকে। সুলক্ষণ পুরুষের মত তাকে দেখাচ্ছিল। প্রশান্ত মুখ, আয়ত চোখ। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে। প্রশান্ত মুখের মধ্যে কোথায় যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। রাজার কেমন যেন মনে হল, এ পারবে।

রাজা বললেন, হে সুলক্ষণ পুরুষ, শোন তুমি যদি আমাকে সারিয়ে তুলতে পার তাহলে অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে তুমি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি পারবে।

কীর্তিসেনা তার কাজ শুরু করে দিল।

রাজার মাথায় বেশ করে মাখালো গরম ঘি। আরামে এতদিন পরে ঘুমিয়ে পড়লেন রাজা। কীর্তিসেনা বলল, আজ রাত্তিরটা

থাক। উনি ঘুমোন। কাল দুপুরে বাকীটুকু করব।

সকলে বিশ্বাস করল। এতদিন বাদে রাজা ঘুমুতে পেরেছেন এটাই তো বিশ্বাসের কারণ। কীর্তিসেনাকে সকলে খুব আপ্যায়ন করল।

রাক্ষসী যে পথ বাৎলে দিয়েছিল সেই পথে পরের দিন দুপুরে কীর্তিসেনা রাজার মাথার ভেতর থেকে অনেকগুলো কানবিছা বের করল। এক একটা বিছা কলসীর জলে এসে পড়ে আর আশপাশের দর্শক মানুষেরা অবাক হয়ে যায়। এক এক করে বেরুল একশ পঞ্চাশটা কানবিছা। রাজা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল যেন পুনর্জন্ম হল। কঠিন অসুখের পর সুস্থ হলে সেইরকমই মনে হয় মানুষের।

রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হল।

রাজা কীর্তিসেনাকে পূর্বের প্রতিশ্রুতিমত অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে চাইলে সে তা নিতে অস্বীকার করল। বলল, কি হবে আমার রাজত্ব! সামান্য মানুষ আমি। অত কিছু দরকার নেই।

কৃতজ্ঞ রাজা তখন তাকে গ্রাম, রত্নালঙ্কার ইত্যাদি উপহার দিলেন। সেগুলি রাজারই কাছে গচ্ছিত রেখে বলল, এখন আমি একটা ব্রত উদ্‌যাপন করব। এগুলো থাক আপনার কাছে। পরে দেখা যাবে।

সকলে অবাক হয়ে গেল।

এ কি রকম মানুষ!

ধনরত্নে মোহ নেই!

কীর্তিসেনার তখন অন্য চিন্তা। একমাত্র চিন্তা তার, কি করে স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে!

তার সাধনার ফল ফলল অবশেষে।

কিছুদিন বাদে লোকজনের মুখে শুনল যে দেবসেন নামে এক বণিক বলভীনগরী থেকে বসুদত্তনগরীর দিকে যাত্রা করেছেন।

এই দেবসেনই কি তার স্বামী!

ব্যাকুল হয়ে সে অপেক্ষা করে। দিন গোণে। অবশেষে একদিন দেবসেন নামে বণিকটি এসে পৌঁছালেন বসুদত্তনগরীতে। নিশ্চিন্ত

হল কীর্তিসেনা। হ্যাঁ, তার স্বামীই এসেছে।

এতদিনের সব সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল। সে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল তার পায়। অজ্ঞান হয়ে গেল।

দেবসেন অবাক। এ কি ব্যাপার!

কিন্তু দেবসেনের মনের মধ্যে শুরু হয় আলোছায়ার খেলা। মনে হয় এই পুরুষটি বুঝি তার খুবই চেনা মানুষ, অতি প্রিয়জন। কিন্তু কে সে? কিছুতেই মনে আসে না। কে এই পুরুষ? কে সে? কে? কে? কে?

জ্ঞান ফিরে আসে কীর্তিসেনার।

বিমূঢ় দেবসেনের সামনে পুরুষের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে সে।

—তুমি, তুমি কীর্তিসেনা?—আনন্দে বিস্ময়ে দেবসেনের ভাঙা গলার স্বর শোনা যায়।

—তুমি এখানে কি করে এলে? এই বেশে কেন?—আবার সে বলে।

কীর্তিসেনার মুখে তখন প্রশান্তি আর আনন্দের ছাপ। সে এক এক করে সব ঘটনা বলে যায়। অবাক হয়ে শোনে সকলে। বলে, সীতার পরে এমন মেয়ের কথা আর শোনা যায় নি।

রাজা বললেন, এই মেয়ে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে এ হল আমার ছোট বোন। আমার কাছে এর উপহার গচ্ছিত আছে। সেগুলো এবার ফিরিয়ে নিতে হবে।

দেবসেন তার মায়ের আচরণে খুবই বিরক্ত হয়েছিল। সে আর নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইল না। তারা দুজন সেখানে সুখে বাস করতে লাগল।

মৃত্যুর আহ্বান

দেবতারা নাকি অমর। জরা মৃত্যু তাঁদের ভোগ করতে হয় না। মানুষের জগতে কিন্তু সে নিয়ম নেই। মানুষ মরণশীল।

মানুষের জীবনে মৃত্যুর আহবান অমোঘ। সেই আহবান যখন আসে তখন সব ছেড়ে চলে যেতে হয় মানুষকে। পেছনে পড়ে থাকে প্রিয় পরিজন, স্বপ্নসাধ।

মানুষ জানে সে মরণশীল। অথচ কিছুতেই মৃত্যুর কাছে হার মানতে চায় না। দেবতার মত অমর হবার অসাধ্য সাধনায় সে তৎপর হয়। মৃত্যুর হাত এড়াতে চায়।

নাগার্জুনও এমনি সাধনা করেছিলেন।

চিরায়ু নগরে থাকতেন রাজা চিরায়ু। নামেই বোঝা যায়, রাজা ছিলেন দীর্ঘায়ু। নাগার্জুন তাঁরই মন্ত্রীর নাম। চমৎকার মানুষ নাগার্জুন। উদার, দয়ালু মানুষ, অনেক গুণে গুণী। মানুষকে জরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার সাধনায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন। রাজা চিরায়ুর উপর তাঁর বিদ্যা কিছুটা প্রয়োগও করেছিলেন। ফলে রাজা জরাহীন এবং দীর্ঘায়ু হন।

মন্ত্রী নাগার্জুন তাঁর যে ছেলেটিকে সবচেয়ে ভালোবাসতেন সে একদিন মারা গেল। শোকে আকুল হলেন নাগার্জুন। তিনি ভাবলেন, অমর নয় বলেই মানুষ স্বজন বিয়োগের ব্যথা পায়। সেই ব্যথা দূর করতে হবে। আমি মানুষকে জরাহীন এবং দীর্ঘায়ু করতে পারি, কিন্তু মানুষকে অমর করতে হবে।

তিনি তাই মানুষকে অমর করার জন্য অমৃত তৈরি করার সাধনায় নামলেন।

নাগার্জুনের দৃঢ় সংকল্পে এবং অবিচলিত নিষ্ঠায় টনক নড়ল স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের। তিনি অশ্বিনীকুমারদের দূত হিসেবে পাঠালেন নাগার্জুনের কাছে। তাদের বলে দিলেন, যাও তোমরা নাগার্জুনের কাছে। তাঁকে বল গিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা তো মানুষকে মরণশীল করেই সৃষ্টি করেছেন। দেবতাদেরই শুধু অমর করেছেন। নাগার্জুন কেন অমৃত তৈরি করে ভগবানের নিয়মকে উল্টে দিতে চায়? ভগবানের তৈরি নিয়ম যদি উল্টে যায় তাহলে মানুষ এবং দেবতার মধ্যে আর কি পার্থক্য থাকবে তবে? চারদিকে অনাসৃষ্টি ঘটবে, জগৎ ধ্বংস হবে। তাই নাগার্জুন তার সাধনা থেকে বিরত হয় যেন। না হলে দেবতারা তার উপর ভীষণ রেগে যাবেন। তার অমঙ্গল ঘটবে। আর বলো, নাগার্জুন তার যে প্রিয় পুত্রের জন্য

শোকে আকুল হয়ে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড করতে যাচ্ছে, সে তো এখন দিব্যি সুখে রয়েছে স্বর্গে।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রের বার্তা নিয়ে অশ্বিনীকুমাররা মর্ত্যে এলেন। এলেন নাগার্জুনের কাছে। জানালেন ইন্দ্রের বার্তা। পুত্র সুখে আছে শুনে তাঁর মনটা একটু আশ্বস্ত হল। কিন্তু সাধনা পরিত্যাগ করতে হবে শুনে হতাশ হলেন তিনি। দুঃখিত মনে ভাবলেন, মানুষকে অমর করতে চেয়েছিলাম আমি। যাতে আমার মত প্রিয়জনের বিচ্ছেদের বেদনা তাদের না ভোগ করতে হয়। এখন আমার এই ইচ্ছাকে সফল করতে হলে দেবতাদের অপ্রিয় হতে হয়। তা হওয়া উচিত হবে না। আমার আর অমৃত তৈরি করা হল না, আমার মনোরথও সিদ্ধ হল না।

নাগার্জুন অশ্বিনীকুমারদের বলে দিলেন, বেশ, আমি ইন্দ্রের আদেশ পালন করব। তাঁকে গিয়ে বলবেন। ঠিক সময়েই আপনারা এসেছিলেন। তা না হলে আর পাঁচদিনের মধ্যেই আমি অমৃত তৈরি করে ফেলতাম। এই দেখুন কতটা তৈরি হয়েছিল—

অশ্বিনীকুমাররা দেখলেন। প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল অমৃত তৈরির কাজ। তাঁদের সামনেই নাগার্জুন পাত্রটিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেললেন। অশ্বিনীকুমাররা স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে সব জানাতে ইন্দ্রও খুব খুশী হলেন।

এদিকে রাজা চিরায়ু তাঁর ছেলে জীবহরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। যুবরাজ হয়ে আনন্দিত মনে মা ধনপারাকে প্রণাম করতে গিয়ে সে দেখল যে মায়ের মুখে বিষাদের ছায়া লেগে রয়েছে।

সে জানতে চাইল, মা তোমার দুঃখ কিসের? ধনপারা বললেন, বাছা তোরই বা এত আনন্দ কিসের? যুবরাজ হয়েছিস বলে আনন্দ? কিন্তু যুবরাজ হলেই তো আর রাজা হওয়া যায় না। তুই যুবরাজ হয়েই থাকবি। কোনদিন রাজা হতে পারবি না! পারবি না রাজা হওয়ার সুখ ভোগ করতে।

মায়ের মুখে এ কি কথা!

জীবহর হতভম্ব। সে বলে, এ কি বলছ মা?

মা বলেন, ঠিকই বলছি বাছা। এর আগে তোমার আরো অনেক

ভাই তো যুবরাজ হয়েছে। কিন্তু কেউ কি এখনো রাজা হতে পেরেছে?

ঠিক কথা তো।

জীবহর এতটা ভেবে দেখেনি।

কিন্তু কেন?

মা বললেন, বাছা, মন্ত্রী নাগার্জুনের বিদ্যায় তোমার বাবা দীর্ঘায়ু হয়েছেন। তিনি মারা না যাওয়া পর্যন্ত যুবরাজ তো আর রাজা হতে পারে না। তিনি দীর্ঘায়ু হয়েছেন, তুমি বা তোমার ভাইরা আর দীর্ঘায়ু হয় নি। রাজার চোখের সামনেই তাই তাঁর ছেলেরা মারা যাচ্ছে। যুবরাজ হয়েই মারা যাচ্ছে। কেউ আর রাজা হতে পারছে না।

মায়ের কথায় জীবহর হতাশ হল। তাহলে উপায়? যুবরাজ হয়েই তবে মরতে হবে!

ধনপারা বললেন, তবে একটা উপায় আছে।

—কি উপায় মা?

—একটু কঠিন কাজ। তুই কি পারবি বাছা?

—বল না মা। কি এমন কঠিন কাজ!

পুত্রস্নেহে মায়ের দৃষ্টি অন্ধ হয়েছে। নিষ্ঠুর কথা সহজভাবেই তিনি বললেন, বাছা তুমি তো জান মন্ত্রী নাগার্জুন প্রতিদিন আহ্নিক করার পর খাবার আগে দান করেন। চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রশ্ন করেন, কে প্রার্থী আছ? কে কি চাও বল। ঠিক সেই সময় তুমি গিয়ে বলবে যে তুমি তাঁর মাথা চাও। নাগার্জুন সত্যবাদী এবং প্রতিজ্ঞাবন্ধ। তাই তিনি তোমার প্রার্থনা পূরণ করবেন। তাঁর মাথা কাটা হলে তিনি মারা যাবেন। রাজাও প্রিয় মন্ত্রীর শোকে হয় মারা যাবেন, না হয় বনবাসে যাবেন। তখনই তুমি রাজা হতে পারবে।

লোভ বড় ভীষণ রিপু।

জীবহর সেই রিপুর বশীভূত হল। বাবার প্রতি ভালোবাসা অপেক্ষা রাজ্যলোভ বড় হয়ে দেখা দিল।

সে মায়ের কথামত কাজ করার জন্য প্রস্তুত হল।

পরের দিন জীবহর ঠিক সময়ে গিয়ে উপস্থিত হল নাগার্জুনের

বাড়ি। নাগার্জুন যখন আহ্নিকের পর জিজ্ঞেস করলেন, কার কোন জিনিসের দরকার আছে? কে কি চাও?

তখন জীবহর চাইলেন স্বয়ং নাগার্জুনের মাথা।

এমন অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে নাগার্জুন অবাক। মৃত্যু ভয়ে তিনি কিন্তু ভীত নন। তাই একটু সামলে নিয়ে বললেন শান্ত গলায়, বৎস, তোমার এমন অদ্ভুত প্রার্থনা কেন? আমার মাথা নিয়ে তোমার কোন্ কাজ সিদ্ধ হবে? যদি সত্যিই তা তোমার কোন কাজে লাগে তাহলে সানন্দে আমি দান করব।

এই কথা বলে নাগার্জুন জীবহরের দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিলেন। জীবহর খড়্গের আঘাত করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, দেহ থেকে মাথা ছিন্ন হল না। আসলে ওষুধ প্রয়োগে নাগার্জুনের মাথা খুবই সুদৃঢ় ও শক্ত হয়েছিল। বার বার আঘাতেও তা দ্বিখণ্ডিত হল না। খড়্গই বরং দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল বার বার।

ইতিমধ্যে এইসব ঘটনা রাজা চিরায়ুর কানে গেল। তিনি আকুল হয়ে ছুটে এলেন। ছেলেকে তিরস্কার করলেন খুব। নাগার্জুনকে এই পথ থেকে সরে আসতে বললেন। কিন্তু নাগার্জুন অবিচল। তিনি বললেন, মহারাজ আমি যা প্রতিজ্ঞা করি তা পালন করি। সে কথা আপনি জানেন। আপনার ছেলের প্রার্থনাও পূরণ করব। আমাকে দয়া করে বাধা দেবেন না। তাকেও তিরস্কার করবেন না। এতক্ষণ বেঁচেছিলাম শুধু আপনাকে দেখব বলে।

এই বলে জীবহরের নতুন খড়্গে তিনি কিসের গুঁড়ো খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে তাকে আঘাত করতে বললেন।

আশ্চর্য, এবার অতি সহজে, একটিমাত্র আঘাতেই জীবহর নাগার্জুনের মাথা কেটে ফেলল।

প্রিয় মন্ত্রীর মৃত্যুতে চারদিকে শোকের ঝড় বয়ে গেল।

এমনি সময়ে শোনা গেল আকাশবাণীঃ হে চিরায়ু-রাজ্যের মানুষ, তোমরা শোক করো না। পরহিতব্রতে নিঃশেষে যে প্রাণ দান করে তার ক্ষয় নাই। নাগার্জুন বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন।

আকাশবাণী শুনে সকলের কান্না থামল বটে, কিন্তু প্রিয়জনের বিচ্ছেদের বেদনা যে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলে মনে।

সেই অনির্বাণ গোপন গভীর বেদনায় দগ্ধ হতে হতে রাজা রাজ্য ছেড়ে বনবাসে গেলেন।

রানী ও জীবহরের মনের কামনা পূর্ণ হল।

নিজের জীবন দিয়ে জীবহর প্রমাণ করে গেলেন যে মানুষ অমর নয়, মানুষ অমর হয় না।

সাতবাহনের বিদ্যালাভ

মহাকবি কালিদাসের নামে একটা গল্প প্রচলিত আছে।

সে গল্প সকলে জান নিশ্চয়ই।

প্রথম জীবনে কালিদাস ছিলেন মূর্খ। তারপর তাঁর বিয়ের রাত্রে তাঁর স্ত্রী যখন জানলেন যে কালিদাস মূর্খ, সেদিন তিনি স্বামীকে নিন্দা করেন। অপমানে দুঃখে কালিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

রাজা সাতবাহনের ভাগ্যেও স্ত্রীর তেমনি তিরস্কার জুটেছিল।

একদিন রাজা সাতবাহন ও তাঁর রানী স্নান করছিলেন। রাজা রানীর গায়ে খুব জল ছিটোচ্ছিলেন বলে একসময় রানী বললেন, 'দেব মোদকৈঃ পরিতাড়য়ে।' রাজা এই কথা শুনে মনে করলেন, রানী বোধহয় মোদক অর্থাৎ মিষ্টি চাইলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ একরাশ মিষ্টি আনলেন।

মিষ্টি দেখে রানী অবাক। বললেন, 'কি হবে এত মিষ্টি?'

রাজা বললেন, 'বাঃ, তুমি তো মিষ্টি চাইলে—'।

রানী বুঝলেন যে রাজা তাঁর কথার অর্থ ধরতে পারেন নি। ব্যঙ্গের হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমি বলেছিলাম আমার দিকে উদক অর্থাৎ জল নিক্ষেপ করবেন না। আপনি কী মা এবং উদক শব্দের সন্ধি জানেন না? ব্যাকরণের এই অংশ কী আপনার জানা নেই? আপনি কী এতই মূর্খ?' রানীর কথা শুনে রাজা ভীষণ লজ্জিত হলেন। মাথা নীচু করে ফিরে এলেন তিনি রাজপ্রাসাদে। তাঁর আর

কিছুই ভালো লাগছে না। তিনি মনে মনে শপথ করেছেনঃ 'হয় জ্ঞানলাভ করব না হয় মৃত্যুবরণ করব।' রাজকার্যে তাঁর আর মন নেই। কারোর সঙ্গে কথা বলেন না তিনি। চুপচাপ বসে থাকেন।

রাজার এই রকম অবস্থা দেখে সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠল। এ কী হল! রাজ্য যে এবার ছারখার হবে। মন্ত্রী গুণাঢ্য এবং সর্ববর্মাও সে কথা শুনলেন। তাঁরা রাজহংস নামে ভৃত্যকে ডেকে পাঠালেন। সে বলল, 'মশায়রা, রাজাকে এমন আনমনা হয়ে থাকতে আগে কখনো দেখিনি। শুনেছি বিষ্ণুশক্তির যে মেয়ে রানী হয়েছেন তিনিই নাকি অপমান করেছেন আমাদের রাজাকে।'

গুণাঢ্য ও সর্ববর্মা এ কথা শুনে হতাশ হলেন। রাজার যদি শরীরের কোন অসুখ হত তা হলে না হয় বৈদ্য ডেকে তার চিকিৎসা হত। কিন্তু এ যে মনের অসুখ। এর চিকিৎসা করবে কে! কী এমন বলেছেন রানী যে রাজা বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন!

পরের দিন সকালে গুণাঢ্য ও সর্ববর্মা রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। জোর করেই যেতে হল তাঁদের। কেননা, এই ঘটনার পর থেকে রাজা অন্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাজার কাছে গিয়ে গুণাঢ্য বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে আপনার?'

রাজা তবুও কথা বলেন না।

সর্ববর্মা রাজহংসের মুখ থেকে রানীর অপমানের কথা কিছুটা শুনেছিলেন। তিনি কৌশল করে বললেন, 'মহারাজ গতকাল রাত্রি-বেলায় আমি একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম স্বর্গ থেকে একজন দিব্যপুরুষ মর্ত্যে নেমে এসে একটা পদ্মফুলের পাপড়ি খুলতেই সাদা কাপড়-পরা এক সুন্দর মেয়ে বের হলেন এবং তিনি আপনার মুখে প্রবেশ করলেন। মহারাজ, তিনি যে সরস্বতী সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই।'

কৌশলে কাজ হল।

সাতবাহন একমনে শুনলেন। নড়েচড়ে উঠলেন। উৎসাহিত বোধ করলেন। তারপর খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কত তাড়াতাড়ি একজন অজ্ঞ লোক শিক্ষালাভ করতে পারে আমাকে বলুন তো!' রাজা বেদনার সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'মূর্খ হয়ে আমি আর রাজত্ব করতে

চাই না। একজন মূর্খ লোক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য নিয়ে কি করবে। তা যে উলু বনে মুক্তো ছড়ানোর মত। কিংবা বানরের গলায় গজ-মুক্তার হার।'

রাজার কথা শুনে গুণাঢ্য বললেন, 'মহারাজ আপনাকে আগে ব্যাকরণ শিখতে হবে। কেননা, ব্যাকরণ হল সব বিদ্যা শেখার চাবিকাঠি। ব্যাকরণ ঠিক ঠিক শিখতে একজনের বারো বছর সময় লাগে। আচ্ছা, আমি ছ'বছরের মধ্যেই আপনাকে ব্যাকরণ শিখিয়ে দেব।' গুণাঢ্যের কথা শুনে সর্ববর্মার খুব হিংসে হল। রাজাকে শিক্ষিত করার সব গৌরব গুণাঢ্যই লাভ করবে!

সর্ববর্মা সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কি কথা বলছ গুণাঢ্য। ছ'বছর! সে যে অনেক সময়। মহারাজের মত সুখে লালিত মানুষ এতদিন এত কষ্ট সহ্য করবেন কেমন করে! না মহারাজ, ছ'বছর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি ছ'মাসের মধ্যেই আপনাকে ব্যাকরণ শিখিয়ে দেব।'

ছ'মাসের মধ্যে ব্যাকরণ শিক্ষা!

অসম্ভব কথা।

গুণাঢ্য রেগেমেগে বললেন, 'যদি সত্যি তুমি তা পার তাহলে মানুষের সমাজে যে তিনটি ভাষা প্রচলিত আছে—সংস্কৃত প্রাকৃত ও কথ্য ভাষা—আমি আর সেগুলি ব্যবহার করব না। আমি বরং বোবা হয়ে থাকব।'

এদিকে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সর্ববর্মাও শপথ করল, 'বেশ, যদি আমি না পারি তবে বারো বছর তোমার পাদুকা মাথায় করে বয়ে বেড়াব।'

দু'জনের তর্কাতর্কিতে রাজা কিন্তু মনে মনে খুশী হলেন। ভাবলেন, যাক্ আর ভাবনা নেই ; এদের দু'জনের কারো না কারো কাছ থেকে আমি দ্রুত শিক্ষালাভের সুযোগ পাব।

এদিকে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সর্ববর্মা ভাবল, ঝোঁকের মাথায় যা বলে ফেলেছি তা তো আর ফেরানো যাবে না। এখন উপায় কী! ছ'মাসের মধ্যে ব্যাকরণ শিক্ষা! একটা ভীষণ অসম্ভব কথা বলে ফেলেছি।

নিজের স্ত্রীকে সে সব কথা খুলে বলল। স্ত্রী সব শুনে বলল,

'প্রভু যা বলেছেন তা সত্যই কঠিন ব্যাপার। দেবতা কার্ত্তিকের দয়া ছাড়া এ ব্যাপারে সফল হবার আর কোন উপায় নেই।'

স্ত্রীর কথা মনে ধরল সর্ববর্মার।

উপবাস করে রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি দেবতার মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। গুপ্তচরদের মুখে গুণাঢ্য সে খবর শুনলেন। তিনি রাজার কাছে খবর দিল। রাজা চিন্তা করতে লাগলেন। কী হয় কে জানে!

তখন সিংহগুপ্ত নামে একজন বিশ্বাসী রাজপুত বলল, 'মহারাজ, চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার দুঃখের কথা জেনে আমি দেবী চামুণ্ডার কাছে নিজেকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। দেবী আমাকে দেখা দিয়ে বললেন যে, এরকম কাজ করো না ; রাজার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

সিংহগুপ্তের কথা শুনে রাজার চিন্তা কিছুটা দূর হল। সর্ববর্মা কী করে তা দেখার জন্য সিংহগুপ্ত দুজন চর পাঠাল।

এদিকে সর্ববর্মা শুরু করল কঠিন তপস্যা। একমনে সে ধ্যান করতে লাগল দেবতার। আহার ত্যাগ করল, কথাবার্তা বলা বন্ধ করল, নিজের শরীরের দিকে কোনরকম দৃষ্টি দিল না।

যাকে বলে কায়মনোবাক্যে—সেইরকম তন্ময় হয়ে সে ধ্যান করতে লাগল।

দেবতা কার্ত্তিক সন্তুষ্ট হলেন। সর্ববর্মা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করল। সাতবাহনের কাছে এল সে। সে স্মরণ করা মাত্রই সমস্ত বিদ্যা আবির্ভূত হল—এইভাবে রাজা সাতবাহন বিদ্যা লাভ করলেন।

রাজার বিদ্যালভের আনন্দে রাজ্যে উৎসবের ধুম পড়ে গেল। সর্ববর্মাকে রাজা গুরু বলে স্বীকার করলেন, প্রচুর ধনসম্পদ উপহার দিয়ে তাঁকে ভরুকচ্ছ রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। বিষ্ণুশক্তির কন্যার তিরস্কারেই এই বিদ্যালাভ বলে তাকে প্রধানা মহিষী করলেন।

বিপদে আমি না যেন করি ভয়

রাজা বর্ষবর্মার রাজ্য হর্ষপুরে এক বণিক বাস করত। নাম তার সমুদ্রশূর। ধার্মিক, স্থিরবুদ্ধি, বিত্তবান বণিক। সকলে তাকে এক ডাকে চিনত।

একদিন সে বাণিজ্যে বেরুল। যাবে সুবর্ণদ্বীপ। সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে। সমুদ্রযাত্রা তার কাছে আনন্দের ব্যাপার ছিল। মজবুত, বিরাট জাহাজ ছিল তার, সঙ্গীসাথী ছিল প্রচুর। আর ছিল বহুবার সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা। ছোটখাটো বিপদে এর আগে যে পড়েনি তা নয়। বিপদকে সে ভয়ও করে না।

কিন্তু এবার যা ঘটল তা কল্পনাতীত।

সুবর্ণদ্বীপের প্রায় প্রায় কাছাকাছি এসেছে এমনি সময় আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। মেঘের গুরু গর্জন। ঝড়। বিরাট তালগাছের মত সমুদ্রের ঢেউ উঠতে লাগল। ঢেউ-এর দোলায় কাগজের নৌকোর মত অত বড় জাহাজটা দুলতে লাগল। ঢেউ-এর আঘাতে আঘাতে টালমাটাল হয়ে গেল।

সমুদ্রশূর বুঝল, আর উপায় নেই। জাহাজ ভাঙবে, ডুববে। সে মনে মনে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। ঝাঁপ দিল সমুদ্রে।

আর তক্ষুণি মড় মড় করে ভেঙে পড়ল জাহাজটা। সমুদ্রে ভাসতে লাগল সমুদ্রশূর। কি আর করবে? সাঁতার কাটা মুশকিল। এত বড় বড় ঢেউ-এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সোজা ব্যাপার নয়।

ভাসতে ভাসতে সে দেখল ঢেউ-এর তোড়ে ভেসে এসেছে একটা মড়া। সে সেই মড়াটাকে আঁকড়ে ধরেই ভাসতে লাগল। যা হোক একটা অবলম্বন তো! মরার আগে খড়কুটো নিয়েও বাঁচতে চায় মানুষ।

ভাসতে ভাসতে এক সময় দেখা গেল সুবর্ণদ্বীপের তীর। নিচে পা দিয়ে দেখল পায়ের তলায় মাটি। মড়াকে ফেলে সে তীরে উঠতে যাবে এমন সময় তার নজরে পড়ল একটা জিনিস।

সে দেখল মড়ার কোমরে কাপড় গোঁজা, কাপড়ের মধ্যে কিছু একটা

দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অপরূপ গলার হার একটা। সমুদ্রশূর বণিক। রত্ন চেনে। সে বুঝতে পারল যে, গলার হারটি মূল্যবান রত্নে তৈরি।

জাহাজডুবির পর তার মনটা দমে গিয়েছিল। এতগুলো ধনসম্পদ নষ্ট হল ভেবে। এই হারটা পেয়ে হতাশভাবটা কেটে গেল। একেই বলে রাখে হরি মারে কে। হারটার দাম, যা হারিয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী। মনটা খুশী হয়ে উঠল সমুদ্রশূরের।

হারটা নিয়ে সে দ্বীপের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে সে কলশপুর নগরে এল। পথের মধ্যে দেখল এক মন্দির। সেই মন্দিরে আশ্রয় নিল সে বিশ্রামের জন্য। খুব ক্লান্ত ছিল। শুতে না শুতেই পড়ল ঘুমিয়ে।

আর এমনি সময়ে প্রহরীরা এসে ঘিরে ধরল ঘুমন্ত সমুদ্রশূরকে। কে এই অপরিচিত বিদেশী? সন্দেহ জেগে ওঠে তাদের। রাজ-বাড়ি থেকে জিনিস চুরি যাওয়ার সঙ্গে এই বিদেশীর যোগ আছে।

প্রহরীরা সমুদ্রশূরের পকেট হাতড়াতে শুরু করল। আরে এ কি? এ কি?

এ তো সেই হার!

রাজকুমারী চক্রসেনের হার। ক'দিন আগে যা চুরি গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার। এত প্রহরী, এত চোখ, তার মাঝ থেকে চুরি! রাজা আর বলবেন কি, প্রহরীরা নিজেরাই লজ্জায় মরে যায়।

তারা প্রতিজ্ঞা করেছিলঃ স্বর্গমর্ত্য পাতাল ফেড়ে ফেলব। দেখি সেই হার পাওয়া যায় কিনা।

হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।

এই সেই হার। এই বিদেশী চোরের কীর্তি।

মালশুদ্ধ চোরকে তারা ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা পরিষ্কার করে বলে দিলেন, হ্যাঁ সমুদ্রশূরই চোর। সমুদ্রশূরের হাত থেকে হারটা নিয়ে সবাইকে রাজা দেখাতে লাগলেন, দেখুন সকলে—মিলিয়ে দেখুন। এ হার চক্রসেনের গলায় হার।

স্বীকার করল সকলে।

গলার হারটা রাজার হাতে।

ঠিক এমনি সময়ে একটা শকুন হঠাৎ ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল

সেই হারটা। কি হল কি হল—বোঝার আগেই শকুন উড়ে চলে গেছে অনেকদূর। ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

রাজার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সমুদ্রশূরের উপর। রাজা তখন আদেশ দিলেন, এই বিদেশী চোরকে মৃত্যুদন্ড দিলাম।

সমুদ্রশূরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল।

বধের তোড়জোড় হচ্ছে।

এই সময়ে হঠাৎ আকাশবাণী হলঃ একে বধ করো না। এই ব্যক্তি হর্ষপুরের একজন মান্য বণিক। সমুদ্রশূর এর নাম। বাণিজ্য করতে এসেছে তোমাদের দেশে। তোমাদের অতিথি। চোর সে নয়। যে সত্যি চোর সে মরে গেছে। সেই চোরের মড়াকে ধরে সমুদ্রশূর তোমাদের দেশে এসেছে। একে মুক্তি দাও। সম্মান প্রদর্শন কর।

বণিক মুক্তি পেল। শুধু মুক্তি নয়, রাজা তাকে ধনরত্ন দিলেন। বণিক সেই ধনরত্ন দিয়ে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে হর্ষপুরের দিকে যাত্রা করল।

সমুদ্র পেরিয়ে পথে পড়ে বন। বনের মধ্যে দিয়ে পথ হর্ষপুরের দিকে গিয়েছে। সেই বনপথে চলতে চলতে ঘটল বিপদ। ডাকাত তাদের আক্রমণ করল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল সংগীসাথীরা। কেউ কেউ নিহত হল। সমুদ্রশূর একটা বড় গাছের উপর উঠে বসেছিল। ডাকাতরা কেউ তাকে দেখতে পেল না।

সমুদ্রশূরের মন দুঃখে ভরে গেল।

আমাকে নিয়ে এ কি পরীক্ষা ভগবানের? বার বার বিপদের মধ্যে ফেলছেন। একবার জাহাজডুবি হল। সব ধনরত্ন গেল। আবার ঘটনাচক্রে যদি বা ধনরত্ন পেলাম, তাও গেল এই বনের মধ্যে ডাকাতের হাতে।

কিন্তু সমুদ্রশূর স্থিরবুদ্ধি। দুঃখের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই সে আবার মনকে স্থির করল। বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

রাত কেটে গেল। ভোর হল।

গাছ থেকে নামতে গিয়েই হঠাৎ গাছের উপরে নজর পড়ল তার। পাখির বাসা। কিন্তু বিরাট বাসা। সচরাচর এমন বাসা দেখা যায় না। কৌতূহলী সমুদ্রশূর গাছের উপর উঠতে লাগল। বাসাটা দেখবে। বাসার ভেতরে হাত দিয়ে সে অবাক হয়ে গেল—

কি এসব, এসব কি—
রাশি রাশি অমূল্য রত্ন সব।
আরে এ কি?
গলার হার। সেই হার। রাজকুমারীর গলার হার। এ তাহলে সেই চোর শকুনের বাসা। তারই রত্নভাণ্ডার।
সমুদ্রশূর মনে মনে প্রণাম জানাল দেবতাকে। অযাচিতভাবে অনেক ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এল হর্ষপুরে। বাকী জীবনটা আর কিছু না করলেও চলবে। এতেই সুখে কেটে যাবে।

বুদ্ধিমান প্রতারক

রত্নপুর নগরীতে বাস করত শিব আর মাধব। গলায় গলায় মিল তাদের। দুজনেই ধূর্ত, প্রতারক কিন্তু বুদ্ধিমান। দেহের বল নয়, বুদ্ধির বলে তারা কাজ হাসিল করে।
রত্নপুর সত্যি ছিল রত্নের পুর বা পুরী। সেখানে বাস করত বহু ধনী। নানা কৌশলে শিব এবং মাধব সেখানকার ধনীদের ধন লুঠ করত।
একদিন মাধব বলল, শিব, রত্নপুরের রত্ন তো ঝাঁঝরা করে এনেছি। এবার চল এখান থেকে একটু অন্যদিকে যাওয়া যাক্।
শিব সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।
—ঠিক ঠিক। চল না উজ্জয়িনীতে। সেখানে শুনেছি শঙ্করস্বামী নামে একজন মহাধনী বাস করে। শুনেছি সে নাকি দারুণ কৃপণ এবং ভীষণ লোভী। লোভীকে ছলনা করা কঠিন নয়। শঙ্কর-স্বামীকেও কাৎ করে ফেলতে কতক্ষণ!
অতএব শিব, মাধব চলল উজ্জয়িনীর দিকে।
উজ্জয়িনীর বাইরে এক গ্রামে মাধব থেকে গেল।
আর শিব নিখুঁত এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে ঢুকে শিপ্রানদীর তীরে বসে তপস্যা শুরু করে দিল। ভোরবেলায় গায়ে

পাঁক মেখে নিত, তারপর নিচের দিকে মাথা রেখে শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে ধ্যানে মগ্ন হত। অনেকক্ষণ পরে স্নান করে একদৃষ্টে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করত, কখনো বা পদ্মাসনে বসে ধ্যান করত।

উজ্জয়িনীর মানুষেরা শিবের কঠোর তপস্যা দেখে অবাক হয়ে গেল।

সকলের মুখে মুখে প্রশ্নঃ কে এই নবীন তপস্বী?

কিন্তু উত্তর দেবে কে?

শিব যে মৌনীবাবা। কথা বলে না কারোর সঙ্গে। তপস্যা শেষ করে ভিক্ষায় বেরোয়। সংগ্রহ করে মাত্র তিন মুঠো চাল, তার বেশী আর তার দরকার নেই। তিন মুঠো চাল তিনভাগ করে সে। এক ভাগ দেয় পশুপক্ষীদের, এক অংশ রাখে অতিথিদের জন্য আর এক অংশ মাত্র সে নিজে আহার করে।

কি রকম লোভহীন পুরুষ।

একেই বলে জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়কে যিনি জয় করেছেন।

মানুষের মনে শিব এইরকম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে শুনে মাধব আশ্বস্ত হল। দুজনের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার প্রথম ধাপ সফল হয়েছে। এবারে মাধব উজ্জয়িনীতে ঢুকতে পারে।

কয়েকদিন পরে সে এল উজ্জয়িনীতে। আশ্রয় নিল এক মঠে। একদিন শিবকে গিয়ে শ্রদ্ধাও জানিয়ে এল। শিব তখন চোখ বন্ধ করে তপস্যায় মগ্ন। মাধবের গলার স্বর শুনেই বুঝেছিল স্যাঙাৎ এসেছে। কিন্তু চোখ সে খুলল না। মাধব তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অন্যান্য মানুষদের জানাল, মশায়রা ইনি সাক্ষাৎ দেবতা। বহু তীর্থে এঁকে দেখেছি। কিন্তু সর্বদাই মৌন। লোকে এঁকে মৌনীবাবা বলে ডাকত।

সকলেই মাধবের কথায় সায় দিল।

—সে আর বলতে, সে আর বলতে। এঁর আবির্ভাবে উজ্জয়িনী নগরী ধন্য হল।

গভীর রাতে মাধব বেরুলো মঠ থেকে। একা। এল শিবের আস্তানায়। মৌনীবাবার তখন অন্য রূপ। একাহারী মানুষটি স্যাঙাতকে নিয়ে নানারকম খাবার নিয়ে বসল ভোজনে। ফিসফিস ষড়যন্ত্র আর হাসাহাসি চলল খুব।

—কি মৌনীবাবা, তপিস্যে চলছে কেমন?

শিব বলে, আর বলিস কেন ভাই। যা করবার কর ভাই তাড়াতাড়ি। আমার খেল তো দেখাচ্ছি। এবার তোর খেলার পালা। দেখা এবার।

—যা প্যাঁচ কষেছি না! শঙ্করস্বামীর মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দোব এবার।

মুখ আর মাথা কাছাকাছি এনে দুজনে ফিসফিস শুরু করে।

ক'দিন পরের কথা।

মাধবের একজন অনুচর গেল শঙ্করস্বামীর বাড়ি। তাকে বস্ত্র উপহার দিয়ে বলল, মহামান্য মাধব আপনাকে এগুলি উপহার দিয়েছেন।

শঙ্করস্বামী অবাক।

—মাধব কে?

অনুচরটি বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল, মহামান্য মাধব দক্ষিণাপথের একজন ধনী রাজপুত। আত্মীয়দের সঙ্গে কলহে অতিষ্ঠ হয়ে বহু ধন নিয়ে তিনি উজ্জয়িনীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আপনার নাম তিনি শুনেছেন। তিনি আপনার সেবা করতে চান।

ধনী রাজপুত! তাঁর সেবাকাঙ্খী!

লোভী শঙ্করস্বামীর মনে লোভের ছোঁওয়া লেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, বেশ, বেশ। তিনি আগামীকালই আসুন না কেন!

পরের দিন শঙ্করস্বামীর বাড়িতে এল মাধব। কি-তার বেশ! হাতে গদা, পোশাকের কি বাহার, আগে পেছনে অনুচর। রাজ-পুরোহিত শঙ্করস্বামী আনন্দে আটখানা হয়ে অভ্যর্থনা করল মাধবকে। মাধবও বুঝল ওষুধ ধরেছে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে।

শঙ্করস্বামী রাজাকে জানালো মাধবের কথা। মাধবের অনুরোধমত রাজাকে জানালো, এরকম মাননীয় ব্যক্তিকে বৃত্তি দিয়ে রাজসেবার কোন কাজে নিযুক্ত করা উচিত।

রাজপুরোহিতের অনুরোধ বৃথা গেল না। মাধব রাজসেবার কাজে নিযুক্ত হল। তাদের ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় ধাপ শেষ হল।

দিন যায়।

মাধব মন দিয়ে রাজসেবা করে। খুব বিশ্বাসী হয়ে ওঠে রাজা ও

প্রজাদের। গভীর রাতে শিবের ঘরে নিয়মিত চলে তার যাতায়াত।

শঙ্করস্বামীও মনে মনে প্ল্যান আঁটছে। কি করে ধনী মাধবের ধন হাতানো যায়। সে ভাবল, মাধবকে দূরে রাখা ঠিক নয়। কি জানি ফস্কে যায় যদি।

সে তাই মাধবকে বলল, নিজের বাড়ি মনে করে আপনি আমার বাড়িতেই থাকুন না কেন!

এই সুযোগই মাধব খুঁজছিল। সে রাজী হয়ে গেল। একটা বিরাট বাক্স নিয়ে সে উঠল এসে শঙ্করস্বামীর বাড়ি। বাক্সখানার চেহারা দেখে শঙ্করস্বামীর চোখ চকচক করে উঠল। কত না জানি মূল্যবান ধনরত্ন আছে এতে।

শঙ্করস্বামীর বাড়িতে রাজার হালে আছে মাধব। শঙ্করস্বামী আশপাশে আছে জানলে মাঝে মাঝে সেই বাক্সটা খোলে সে। ভাব দেখায় যেন অতি সন্তর্পণে বাক্স খুলছে সে। ভেতরে যে সব ধনরত্ন আছে তারই দু'একটা নাড়ে চাড়ে। টুং টাং শব্দ হয়। চোরের মত চুপিসাড়ে লুকিয়ে থাকা শঙ্করস্বামীর কানে সেই শব্দ জলতরঙ্গ হয়ে বাজে।

কবে, কতদিন বাদে এগুলি তার হবে?—এই তার দিনরাতের চিন্তা।

মাধব যখন দেখল যে শঙ্করস্বামী তাকে বিশ্বাস করেছে তখনই মোক্ষম চাল চালল সে। দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করল। জীবনের আশা বুঝি নেই তার আর।

সে একদিন শঙ্করস্বামীকে ডেকে বলল, হে ব্রাহ্মণ, আমার অবস্থা তো এখন তখন হয়ে উঠেছে। ইহলোকের মত পরলোকেও আমি সুখী হতে ইচ্ছা করি। আপনি কোন সৎ ব্রাহ্মণকে ডাকুন। আমার ধনরত্ন তাঁর হাতে সম্প্রদান করে যাই। ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে তো আর মোক্ষ লাভ করা যায় না।

কি আর করে শঙ্করস্বামী।

সে ব্রাহ্মণদের ডাকতে লাগল।

কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকেই মনে ধরে না মাধবের। বলে, এ'র চেয়েও সৎ ব্রাহ্মণ চাই। খোঁজ করে আনুন।

মাধবের পাশেই ছদ্মবেশে ছিল তার এক অনুচর। সে শঙ্কর-

স্বামীকে বলল, মশায় কোন সাধারণ ব্রাহ্মণ এঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। এক কাজ করুন আপনি। শিপ্রানদীর তীরে শিব নামে তপস্বী আছেন। ডেকে আনুন তাঁকে। দেখা যাক তিনি একে সন্তুষ্ট করতে পারেন কিনা।

অতএব শংকরস্বামী গেল শিবের কাছে।

শিব তো তখন ধ্যানে তন্ময়। মানুষের মনের কথা কে বুঝবে, শিব তখন শুভমুহূর্তেরই ধ্যান করছিল। ভাবছিল, মাধব কবে সফল হবে। কবে ডাক পড়বে তার।

শংকরস্বামী সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম করল।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল শিব।—কি চাই বৎস!

কাতর অনুরোধ করতে লাগল শংকরস্বামী, প্রভু আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে। আমার উপর অযথা রাগ করবেন না প্রভু। দাক্ষিণাপথ থেকে মাধব নামে এক রাজপুত আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন তাঁর জীবনসংশয় উপস্থিত। তিনি আপনাকেই তাঁর ধন সম্প্রদান করে যেতে চান।

শিব শিবেরই মত গম্ভীর স্বরে বলে, আমি তো ব্রহ্মচারী। আমার তো ধনের প্রয়োজন নেই। শংকরস্বামী দেখল এই সুযোগ।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, প্রভু আপনি বিজ্ঞ, আপনি কি জানেন না যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ! সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া এক কথা। আর সংসারে থেকে বিষয়কর্ম সম্পর্কে মোহ না থাকাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

শিব বলল, সে কি কথা, আমি গৃহস্থ হব কি করে!

—তার উপায় আছে প্রভু।

—কি উপায়?

—বিয়ে করলেই গৃহস্থ হওয়া যায়।

—বিয়ে!

বিনয়ে গদগদ হয়ে শংকরস্বামী বলে, হ্যাঁ প্রভু বিয়ে। এই তো আমারই এক কন্যা আছে। নাম তার বিনয়স্বামিনী। রূপে-গুণে তার জুড়ি নেই। নিজের মেয়ে তাই বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু সে আপনার উপযুক্ত হবে প্রভু।

শিব নীরবে কি যেন ভাবে।

শঙ্করস্বামী আবার বলে, আমি কথা দিচ্ছি, ধনরত্নের কলঙ্কের ছোঁওয়া থেকে আপনাকে মুক্ত রাখব। মাধব আপনাকে যে ধনরত্ন দেবেন আমিই তা রক্ষণাবেক্ষণ করব।

মনে মনে হাসে শিব।

তাই বুঝি! সেইজন্যই এত চেষ্টা।

অনেকক্ষণ পরে শিব যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হয়। বলে, ভক্তের প্রার্থনা না পূরণ করে পারি না। বেশ, তোমার অনুরোধ রাখব। তোমার মেয়েকে বিয়ে করে গৃহস্থাশ্রম পালন করব। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী। ধনরত্ন সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই। কোন আগ্রহও নেই। সে সব তুমি দেখবে।

শঙ্করস্বামী ভাবল, ব্যাস তার কাজ হাসিল। সে যে নতুন একটা ফাঁদে পা দিল তা বোঝার ক্ষমতা তার ছিল না।

এক শুভদিনে বিনয়স্বামিনীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়ে গেল। অসুস্থ মাধবের কানেও সে খবর পেঁছাল। যাক্ ঘটনা তাহলে ঠিক ঠিক এগোচ্ছে।

দিন তিনেক পরে।

শিব শঙ্করস্বামীর সঙ্গে এল অসুস্থ মাধবের কাছে। তাকে দেখেই মাধব যেন আলো দেখতে পেল। বলল শঙ্করস্বামীকে, হ্যাঁ এতদিন বাদে আপনি ঠিক মানুষটিকে এনেছেন। তপস্বী শিবের জুড়ি নেই। জ্যোতির্ময় পুরুষ। এঁকে আমার সব ধনরত্ন সম্প্রদান করে শান্তভাবে মরতে পারব। আপনিও কম নয় শঙ্করস্বামী। আপনার ভক্তির টানে মৌনীবাবাও কথা বলেছেন।

সম্প্রদানপর্ব শেষ হল।

যথারীতি সেই বাক্সবন্ধ ধনরত্ন শিব শঙ্করস্বামীর কাছে গচ্ছিত রাখল। শঙ্করস্বামী প্রাপ্তিস্বীকার করে একটা রসিদ লিখে দিল। আনন্দে আটখানা সে। কি করছে তলিয়ে দেখার অবকাশও নেই। সেই বাক্সবন্ধ অমূল্য রত্নরাজির তুলনায় তার সম্পত্তি তো নগণ্য— এই রকম একটা ধারণা তার মনে গড়ে উঠেছিল। তাই সে শিবকে নিজের সম্পত্তি সব দিয়ে দিল। শিবও প্রাপ্তিস্বীকার করে একটা রসিদ লিখে দিল। শিব বলল, এবার তো গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছি আমি। আর তোমার ঘরে থাকি কেন! এবার স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক

বাসায় থাকব।

—ঠিক আছে, যা অভিরুচি।

লোভী শঙ্করস্বামী মনে মনেও তো চায় না যে শিব এখানে থাকুক।

ইতিমধ্যে রোগের ভান ত্যাগ করে মাধবও সুস্থ হয়ে উঠেছে। শঙ্করস্বামীকে সে বলেছে, আপনার পুণ্যকাজের জন্যই আমি আরোগ্য লাভ করেছি। মহর্ষি শিব আমাকে জীবনদান করেছেন। যে কদিন বাঁচব তাঁরই সেবা করে কাটাব।

এই বলে সে শিবের বাড়িতে গিয়ে থাকতে লাগল। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার ফলে দুজনের মনই আনন্দে পূর্ণ।

এদিকে কালক্রমে শঙ্করস্বামীর অর্থের প্রয়োজন হল। নিজের সব সম্পত্তি তো সে শিবকে দিয়ে দিয়েছিল। এতদিন বাদে সে মাধবের বন্ধ বাক্সের ডালা খুলল। নকল সোনা সোনার চেয়েও বেশী চকচকে। শঙ্করস্বামীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল সেই চমকানিতে।

সে খুব সাবধানে একটা মাত্র রত্ন তুলে নিল। উদ্দেশ্য, এটা দোকানে বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করবে।

দোকানী কিছুক্ষণ দেখেই রত্নটা আবার শঙ্করস্বামীকে ফেরৎ দিল। বলল, কোথা থেকে এনেছেন? এ যে নকল। তবে বাহাদুর বটে কারিগর। এমন চমৎকার নকল তো সচরাচর দেখা যায় না।

মুখ শুকিয়ে গেল শঙ্করস্বামীর।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতই হল বুঝি তার মাথায়।

এক এক করে সব রত্নই সে এনে দেখাতে লাগল। সবগুলিই নকল। পাগলের মত সে ছুটে এল শিবের বাড়িতে। বলল, আপনার অলঙ্কার আপনি ফেরৎ নিন। আমার সম্পত্তি আমাকে ফেরৎ দিন।

এমনটা যে হবে এ তো জানত শিব।

মৃদু হেসে সে বলল, তোমার সম্পত্তি কবেই তো ব্যয় করে ফেলেছি।

শঙ্করস্বামী তখন চিৎকার করতে লাগল। শিবকে গালাগালি দিতে লাগল। লোক জমে গেল রাস্তায়।

রাজার কানে খবর গেল।

রাজা দুজনকেই ডেকে পাঠালেন।

শঙ্করস্বামী বলল, মহারাজ, শিব এক প্রতারক। সে বাক্স বন্ধ করে নকল রত্ন আমাকে দিয়েছিল। বিনিময়ে আমি তাকে আমার সব সম্পত্তি দিয়েছিলাম। সে আমাকে ঠকিয়েছে।

শিব বলল, মহারাজ ছোটবেলা থেকেই আমি সংসার ছেড়েছি। তপস্যা শুরু করেছি। এই শঙ্করস্বামীই আমাকে মাধবের দান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। আমি তাতে সম্মত হই বটে, কিন্তু বলে দিই যে ধনসম্পদের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। শঙ্করস্বামী সেই ধন রক্ষণাবেক্ষণ করতে রাজী হয়। এরপর সে স্বয়ং মূল্য নির্ধারণ করেই আমার কাছ থেকে সেই বাক্সবন্ধ রত্ন কিনেছিল। বিনিময়ে আমাকে তার সংপত্তি দিয়েছিল। আমাদের উভয়ের কাছেই এ ব্যাপারে প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ আছে। এই দেখুন।

রাজা রসিদ দেখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মাধব বলে উঠল, সকলের কথায় মনে হচ্ছে আমিই যেন প্রতারক। হে মহারাজ, আমার নিবেদন শুনুন। বাল্যকালে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু ধনরত্ন আমি লাভ করেছিলাম। তপস্বী শিবকে আমি সেগুলি দান করি। কিন্তু দানের পরই মহারোগ থেকে উদ্ধার পাই। আপনি বিজ্ঞ, আপনি জানেন যে, মহাদানেই মহারোগ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আমার কাছে যে ধনরত্ন ছিল সেগুলি নকল নয়। শঙ্করস্বামীর কাছে থাকতে থাকতেই সেগুলি নকল হয়েছিল। বুঝুন ব্যাপারখানা। আসলে তপস্বী শিবকে বঞ্চনা করার চেষ্টাতেই সেগুলি নকল হয়েছে। মানে নকল করা হয়েছে।

শিব ও মাধবের যুগপৎ আক্রমণে শঙ্করস্বামীর মুখে কথা জোগালো না। সে হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বিচার শেষ করে বলল, শিব বা মাধব কারো তো দোষ দেখি না।

অন্যান্য সকল মানুষ রাজার কথাতেই সায় দিল।

অপবাদের কালোছায়া

অপবাদের শক্তি ভীষণ।

বার বার একজনের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিতে দিতে সকলে কালক্রমে সেই মিথ্যাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। অপবাদ নিন্দ্বকেরাই দেয়। অন্যের যারা ভালো দেখতে পারে না, অন্যের সুখে যারা হিংসা অনুভব করে তারাই মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করে। অন্যকে মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়।

হরস্বামীর জীবনও এমনি মিথ্যা অপবাদে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

গঙ্গাতীরে কুসুমপুর নামে একটি নগর আছে।

সেখানেই বাস করেন হরস্বামী।

তপস্বী তিনি। থাকেন সাধনভজন নিয়ে। সাধ্যমত মানুষের উপকার করেন। কোন প্রার্থী তাঁর কাছ থেকে বিফল হয়ে ফিরে যায় না।

ভণ্ড তপস্বীরা যেমন লোকদেখানো ভক্তি দেখায় হরস্বামী তেমন নন। সত্যিকারের তপস্বী তিনি। মন তাঁর বৈরাগ্যের রঙে রঞ্জিত। ভোগ বাসনা থেকে মুক্ত তিনি। পাঁকাল মাছ যেমন কাদায় থাকে অথচ গায়ে তার পাঁক লাগে না, তেমনি লোকালয়ের মধ্যে থেকেও হরস্বামী বিষয়বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন।

গঙ্গার তীরে ছোট এক পাতার কুটীরে তাঁর বাস। সেই কুটীরে আসবাবপত্রের আড়ম্বর নেই। অথচ একটি শান্তির চমৎকার স্পর্শ মাখানো। এখানে এলে মন জুড়িয়ে যায়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। কত দুঃখী মানুষ আসে। হরস্বামী বলেন, বাবা, আমি তো তোমাদের বিষয়সুখ বাড়াবার পথ বলতে পারবো না।

ভণ্ড সাধুরা কিন্তু ছলনা করে সেই সব কথাই বলে এবং মানুষের মন আকর্ষণ করে।

হরস্বামীর কথায় বিষয়ীলোকেরা কেউ কেউ হতাশ হয়ে চলে যায়। তাদের ধারণা, সাধুরা ভগবানের দূত। তাই ইচ্ছে করলেই মানুষের সব কামনা বাসনা তাদের দিয়েই পূর্ণ করা যায়।

আবার কেউ কেউ বসে থাকে। বলে, না-ই বা দিলে বিষয়সুখের সন্ধান। সাধুবাবা, তোমার কাছে একটু বসি। তোমার কথা শুনলে, তোমার গান শুনলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।

কত গল্প জানেন হরস্বামী।

কি রকম মিষ্টি আর চমৎকার কথা বলতে পারেন। সকলে বসে বসে শোনে।

রাত বাড়ে। মাটির প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলে। গঙ্গার স্রোতের শব্দ শোনা যায়।

—সাধুবাবা তুমি খাবে না!—কেউ বলে।

হরস্বামী মৃদু হেসে উত্তর দেন, আমি তো একাহারী। সকালে ভিক্ষায় বেরোই। যা পাই তাতে একবেলা স্বচ্ছন্দে চলে যায়। রাত্তিরে তো কিছুই খাই না।

—আর ভিক্ষায় কিছু মেলে না যেদিন?

হরস্বামী বলেন, সেদিন তাকেই ভগবানের দান মনে করি। পাওয়াটা যদি তাঁর দান হয়, তবে না-পাওয়াটাও যে তাঁরই দান।

—তোমার কষ্ট হয় না সাধুবাবা!

হরস্বামীর মুখে মৃদু হাসি। বলেন, বাবা, কষ্ট অনেকটা মনের ব্যাপার। মনটাকে যদি একটা দিকে লাগাতে পার তাহলে অন্যদিকের চিন্তা দূর হয়ে যায়। একেই বলে কায়মনোবাক্য অবস্থা। মনটাকে আগে শক্ত করতে হবে। মনটাকে আগে একমুখী করতে হবে।

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে গম্ভীর কথাগুলো গমগম করে বাজে। শান্ত মন নিয়ে সকলে বাড়ি ফিরে যায়। ফিরে যায় হরস্বামীর প্রতি অপার শ্রদ্ধা নিয়ে।

কিন্তু আলোর পেছনে থাকে কালো।

চাঁদের পেছনে রাহুর মত।

সংসারে মহৎ লোক আছে বটে, কিন্তু মন্দ লোকেরও অভাব নেই। আছে খল, আছে নিন্দুক।

সকলের মুখে মুখে হরস্বামীর প্রশংসা শুনে সেইরকম একজন নিন্দুক তেতে উঠল। ভাবল, দাঁড়াও লোকটাকে কুপোকাৎ করি একবার।

সে তৎক্ষণাৎ গুজব ছড়ানোর কাজে লেগে গেল।

একদিন দু'দিন পরে গুজব উঠলঃ হরস্বামী প্রতাকর। বাইরে সাধুর বেশ ধরে থাকে বটে, কিন্তু তার আচরণ রাক্ষসের মত। সে গোপনে শিশুর মাংস খায়। যখন ভিক্ষায় বের হয় তখনই সে পছন্দসই ছেলে দেখে আসে। মন্ত্রবলে রাত্রিবেলা অচেতন করে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। আর গভীর রাতে চলে শিশুমাংসের ভোজ।

গুজবের সাময়িক শক্তি আছে।

একজনের মুখ থেকে অন্যজন শোনে, সে আবার রঙ চড়িয়ে অন্যজনের কাছে বলে। দেখতে দেখতে সারা কুসুমপুরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

—শুনেছেন হরস্বামীর কথা?

—ওঃ কি সাংঘাতিক কথা।

—এরকম ভণ্ডকে নগর থেকে বের করে দেওয়া দরকার।

—দেবদত্তের মুখে শুনলাম। সে শুনেছে তার বন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধু নাকি শিশুভোজন দেখে এসেছে লুকিয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও শুনেছি শত্রুঘ্নের মুখে। সে শুনেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকের মুখে। কি সাংঘাতিক কথা মশাই।

—অথচ লোকটাকে দেখলে তো মনে হয় না!

—ঐ তো কায়দা ভণ্ডদের। দেখলে কিছুতেই ভণ্ড বলে মনে হয় হয় না।

—ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। যা ভয় ঢুকল।

—তা বলতে! সাবধানে থাকতে হবে!

সমস্ত কুসুমপুরের লোকেরাই বলাবলি করতে লাগল হরস্বামীর কথা। সকলেই ভীত, সন্ত্রস্থ। হরস্বামীকে দেখলেই সরে পড়ে। তার ছায়া মাড়ানো তো দূরের কথা, দূর থেকে তার চেহেরা দেখলেই রাস্তা ফাঁকা। ছেলেরা আর রাস্তায় বেরোয় না। মাঠ ফাঁকা। বাগানে ফুল ফোটে, কিন্তু ফুলের মত সুন্দর ছেলেরা না থাকায় বাগান ন্যাড়া মনে হয়।

হরস্বামী বিমূঢ়।

কিসে যে কি হল সে বুঝতে পারে না। শিশুদের সে ভক্ষণ করে! শিশুদের! শিশুকে সে যে দেবদূত বলে জানে। সরল, নিষ্পাপ,

পবিত্র। শিশুদের মধ্যে সে যে ভগবানকে দেখে।

হরস্বামী বিমূঢ় বটে, কিন্তু দুঃখিত নয়। সংসারী মানুষ হলে এসব নিন্দা অপবাদে তার জীবনজীবিকা সংকটাপন্ন হত। কিন্তু সে যে সন্ন্যাসী, তপস্বী। প্রশংসার মত নিন্দা অপবাদও মূল্যহীন তার কাছে। সে তাই জোর গলায় প্রতিবাদ করে না। আর তার নীরবতায় সকলে ভাবে, অপবাদের কথা সত্য বুঝি।

কিন্তু এমন ভয় নিয়ে তো আর চিরকাল বাস করা যায় না।

নগরের ব্রাহ্মণেরা তখন একত্রিত হয়ে মন্ত্রণা শুরু করে দিল। হরস্বামীকে নগর থেকে তাড়াতে হবে এ ব্যাপারে সকলে একমত। ভালোয় ভালোয় সে নগর ছেড়ে চলে যায় তো ভাল—একথা তার মুখের উপর স্পষ্ট জানিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে! কে যাবে হরস্বামীর সামনে!

সাহসে ভর করে কয়েকজন ব্রাহ্মণ হরস্বামীর বাড়ির কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে ডাকতে লাগল।

হরস্বামী বাড়ি থেকে বেরুতেই তাকে ব্রাহ্মণেরা বলল: শোন হরস্বামী, কুসুমপুরের ব্রাহ্মণেরা সভা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তোমাকে আর এই নগরে থাকতে দেওয়া হবে না।

হরস্বামী শান্তমুখে বললেন, আমার অপরাধ?

—তুমি গভীর রাত্রে বাড়িতে শিশুদের ভক্ষণ কর।

হরস্বামী বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা তাহলে আমার বাড়িতে এসে দেখে যান।

হরস্বামীর এমন আহ্বানে সকলে থতমত খেল। কিন্তু বাঘের গুহায় কে আর যাবে!

তখন একজন ব্রাহ্মণ বলল, তুমি দৃষ্টিমাত্রেই শিশুদের ভক্ষণ কর।

হরস্বামী হাসলেন। বললেন, বেশ তো। তারও একটা প্রমাণ হওয়া দরকার। আমি আপনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমার দৃষ্টিমাত্রেই আপনাদের কেউ ভক্ষিত হয় কিনা দেখুন।

এই বলে তিনি ব্রাহ্মণদের দিকে এগুতে লাগলেন।

তাঁকে দেখে ব্রাহ্মণেরা সব ভয়ে দৌড় দিল। হরস্বামী সকলকে অভয় দিয়ে ডাকতে লাগলেন, আপনারা পালাবেন না। দাঁড়ান।

আচ্ছা, দূর থেকে দাঁড়িয়েই আমার নিবেদন শুনুন একটু।

ব্রাহ্মণেরা অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হরস্বামী চেঁচিয়ে বললেন, আমি জানি আপনাদের যদি জিজ্ঞাসা করি কেউ কি স্বচক্ষে আমাকে শিশুমাংস ভক্ষণ করতে দেখেছেন? তখন সকলে বলবেন, না। আপনার সে কাহিনী অন্যের মুখ থেকে শুনেছেন।

ব্রাহ্মণেরা সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

হরস্বামী আবার বললেন, শোনা কথাও কখনো কখনো সত্য হয়। বেশ, আমি সে পথে যাচ্ছি না। আচ্ছা, আপনারা এখানে যে কজন আছেন সবাই পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখুন তো কারোর শিশু খোওয়া গেছে কিনা!

হরস্বামী একটু থামলেন।

ব্রাহ্মণরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলেন যে, এখানে কারোর ছেলে খোওয়া যায় নি।

হরস্বামী আবার বললেন, যায় নি তো! বেশ, এবার আপনারা নগরে গিয়ে বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখুন কারোর ছেলে খোওয়া গেছে কি না!

ব্রাহ্মণেরা বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে সকলের ছেলেই আছে। কেউ খোওয়া যায় নি। তখন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং হরস্বামীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন।

কর্পূরিকার সন্ধানে

রাজা নরবাহনদত্ত বেরিয়েছেন কর্পূরিকার সন্ধানে। রাজকুমারী কর্পূরিকা।

তাকে চেনেন না নরবাহন। তার পরিচয় জানেন না। তবু তার সন্ধানে চলেছেন তিনি। সঙ্গে মন্ত্রী গোমুখ। বিশ্বস্ত সঙ্গী।

নরবাহন স্বপ্নে দেখেছেন কর্পূরিকাকে। এক দেবী স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছেনঃ শীগ্‌গিরই তুমি সমুদ্রতীরের জঙ্গলে একটি

আশ্চর্য নগর দেখবে, সেখানে কিছু সময় বিশ্রামের পর যাবে কর্পূরসম্ভব নগরে এবং সেই নগরেই পাবে কর্পূরিকাকে।

স্বপ্ন কি সত্য হয়!

হয় কি হয় না, তা দেখার জন্যই জেদ চেপেছে নরবাহনদত্তের। গোমুখের সঙ্গে তিনি চলেছেন। চলতে চলতে চলতে চলতে—

হ্যাঁ সমুদ্রতীরে এসে পেঁছালেন তাঁরা। ঐ তো তীরের একটা দিক জুড়ে বন। স্বপ্ন কি মিলে যাচ্ছে? বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সত্যি তাঁরা সন্ধান পেলেন এক আশ্চর্য নগরের।

অপরূপ নগর।

পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত।

কিন্তু মানুষ কই? রাস্তায় ঘাটে দোকানে যেদিকেই চোখ যায় দেখেন শুধু কাঠের পুতুলের সারি। কাঠের পুতুল—নিষ্প্রাণ, নির্জীব। মানুষ নেই। নরবাহনদত্তের খুব কৌতূহল। গোমুখও কৌতূহলী। দুজনে একসময়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। এ রাজ্যের রাজাও কি কাঠের পুতুল নাকি?

না, তা তো নয়।

সিংহাসনে বসে আছে যে, সে যে ইশারা করে তাঁদের ডাকছে। চারপাশে অনেক কাঠের পুতুলের মাঝে জ্যান্ত একটি মাত্র মানুষ। সে দেশের রাজা সে। রাজা ইশারায় কাছে যেতে বলছে।

—কে তোমরা? কাঠের পুতুলের দেশের রাজা প্রশ্ন করল, এখানে এলেই বা কি করে? কে সন্ধান দিল এ রাজ্যের?

নরবাহনদত্ত আদি-অন্ত খুলে বললেন সব। জানতে চাইলেন এ দেশের খবর। কাঠের পুতুলের রহস্য জানতে চাইলেন।

তখন সেই আজব দেশের রাজা বলতে শুরু করলেনঃ কাঞ্চী নগরীতে বাহুবল নামে এক রাজার রাজত্বে আমরা বাস করতাম। আমি রাজ্যধর এবং আমার দাদা প্রাণধর। ময়দানবের নাম শুনেছেন তো? ময়দানব কাঠের মায়াযন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। আমরা দুই ভাইও সেই রাজ্যে কাঠের মায়াযন্ত্র প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। দাদার একটা বদ্‌খেয়াল ছিল। সেই খেয়াল মেটাতেই টাকাকড়ি জলের মত খরচ করত। দুজনে মিলে আয় আমরা কম করতাম না। আমার আয় সবটাই দাদার হাতেই তুলে দিতাম। পরিবার

পালনের দায়দায়িত্বও আমাদের ছিল না। তবু দাদার খাঁই মিটত না। লোকে বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। তাই হল শেষে। দাদা চুরির পথ ধরল। সে কাঠের চমৎকার একজোড়া রাজহাঁস তৈরি করেছিল। এও মায়াযন্ত্র। প্রত্যেকদিন সেই মায়যন্ত্রে সুতো লাগিয়ে রাজার ধনাগারে রাত্রি বেলা দাদা ছেড়ে দিত। রাজহংস দুটি ঠোঁট দিয়ে টাকাকড়ি মণিমাণিক্য সব খুঁটে আনত। চুরি চলত প্রত্যেক রাতে। কত বারণ করেছি। দাদা সে সব কানেই তুলত না। এদিকে সেই রত্নাগারের ভাণ্ডারী কিছু বুঝতে না পেরে রাজাকে জানাল যে প্রতিদিন রত্নভাণ্ডার থেকে রত্ন চুরি হয়ে যাচ্ছে। কে চুরি করছে ধরা যাচ্ছে না। রাজা তখন গোপন পাহারার ব্যবস্থা করলেন। গভীর রাতে রক্ষকরা দেখল যে ঘরের মধ্যে কাঠের রাজহাঁস দুটো ঘরে ঢুকল। তাদের পেছনে সুতো বাঁধা। সুতোটা কেটে রাজ হাঁস দুটো ধরল তারা। সকালে রাজাকে দেখাল সব। বুদ্ধিমান চোরের কীর্তি। যখন শুধু সুতো ফিরে এল, রাজহাঁস ফিরল না, তখন আমার দাদা পড়ল মহাফাঁপরে। আমাকে ডেকে বলল, ভাইরে সব্বনাশ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই গোপনে রাজা লোক লাগিয়েছে। এবার ধরা পড়তে হবে। কঠিন শাস্তি দেবে। রাজার বুঝতে বাকী রইবে না এ কার কীর্তি। কারণ এ রাজ্যে আমরা দুজনেই মাত্র মায়াযন্ত্র তৈরি করতে জানি। চল এখনি পালাই। আমার কাছে আকাশে ওড়ার একটা যন্ত্রযান আছে। তাতে করেই পালাই চল দুজনে। আমি দাদার সঙ্গে এই যন্ত্রযানে যেতে চাইলাম না। কারণ ছোট্ট যানটা কত লোকের ভার সইবে। মাঝপথে ভেঙে পড়তে পারে। দাদা ও তার পরিবারের লোকেরা চলে গেল। আমি রইলাম একা। তখন রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। একা বসে বসে ভাবছি, রাত শেষ হলেই তো ডাক আসবে। তখন কোন অপরাধ না করেও আমাকে শাস্তি পেতে হবে। অপমানিত হতে হবে। নাঃ, এ অপমান সহ্য করতে পারব না কিছুতেই। তাই আমি আর একটি যন্ত্রযান তৈরি করে তাতে চেপে বসলাম। এ গাড়িটা দাদার গাড়ির মত অত তেজী নয়। কিন্তু তাহলেও রাজ্য ছাড়িয়ে বেশ অনেকটা দূরে চলে এলাম। একসময় নিচের দিকে তাকিয়ে ভয় ধরে গেল। নীল জলরেখা না? সমুদ্র তাহলে সামনেই। শেষ নেই সমুদ্রের।

এর উপর দিয়ে উড়ে উড়ে কোথায় যাব? হয়ত গাড়িটা একসময় বিকল হয়ে উল্টে পড়বে জলে। মরতে হবে। তাই সমুদ্রের তীরেই নেমে পড়লাম। পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রতীরের জঙ্গলে ঢুকেছি, জঙ্গলের মধ্যে এই অদ্ভুত জনশূন্য নগর দেখেছি, ফাঁকা রাজ-প্রাসাদের ফাঁকা সিংহাসনে এসে বসে পড়েছি। রাজা হয়েছি। কেউ বাধা দেবার নেই। আজব দেশের রাজা। রাজসুখ ভোগ করে চলেছি। যা চাই তা পাই। পাই না শুধু মানুষের দেখা। সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নেই।

আজব দেশের রাজা রাজ্যধর নিজের কাহিনী শেষ করে বলল, আপনারা দৈবাৎ যখন এসে পড়েছেন তখন থাকুন দু'একদিন। মানুষের সঙ্গ পেয়ে আমি বাঁচি। এখানে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। কাঠের পুতুল সব বানিয়েছি। কথা তারা বলতে পারে না বটে, কিন্তু হুকুম তামিল করে।

নরবাহনদত্ত এবং গোমুখ থাকতে রাজী হলেন। রাজার মনে তখন অন্য চিন্তা। দেখা পাব তো কর্পূরিকার? স্বপ্ন সফল হবে তো? আজব দেশের রাজা অবশ্য তাঁকে বলেছে, কোন চিন্তা করবেন না। স্বপ্ন সফল হবেই। আমার সাধ্যমত সাহায্য আপনাকে করব। যারা বীর, যারা সাহসী, যারা নিষ্ঠাবান—তাদেরই স্বপ্ন সফল হয়। দুর্বলের স্বপ্ন কখনো ফলে না।

পরদিন সকালে রাজ্যধর আকাশে ওড়ার এক চমৎকার শক্তিশালী যন্ত্রযান প্রস্তুত করল। নরবাহনদত্ত এবং মন্ত্রী গোমুখ সেই যানে বিপুলবেগে সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চললেন। সমুদ্রের পরপারেই আর একটা নগর দেখা যাচ্ছে। সেই নগরের কাছাকাছি আসতেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা আপনা হতেই নামতে শুরু করল।

নরবাহনের মনে তখন দারুণ প্রতিক্রিয়া। গোমুখকে বললেন, এটাই কি সেই রাজ্য?

গোমুখ বলে, মনে তো হচ্ছে। নেমেই দেখা যাক না!

দু'জন তখন সেই রাজ্যের ভেতরে ঢুকতে লাগলেন। এদিকে পথশ্রমে দুজনেই খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রামের দরকার। পথে দেখলেন একটি সুন্দর ঘরের বারান্দায় বসে আছে এক বুড়ী। তাঁরা এগিয়ে গিয়ে বুড়ীকে প্রণাম করে বললেন, বুড়িমা, আমরা বিদেশী

অতিথি। একটু আশ্রয় চাইছি। তাদের সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহেরা দেখে, মধুর কথা শুনে বুড়ীর মনে দয়া হল। বুড়ী একাই বাড়িতে থাকে। বুড়ীর বাড়িতেই তারা আশ্রয় পেলেন।

বিশ্রামের পর বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন নরবাহন, বুড়িমা, এ রাজ্যের নাম কি?

—এ রাজ্যের নাম বাবা কর্পূরসম্ভব।

নরবাহনদত্তের মনে ছলাৎ করে উঠল আনন্দের ঢেউ। সেই আবেগ চেপে রেখে গম্ভীর মুখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, রাজ্যের রাজার নাম কি? রাজপুত্র, রাজকুমারী ক'জন?

বুড়ী বলতে শুরু করল, তাহলে এ রাজ্যের কাহিনী শোন বাবারা। এই কর্পূরসম্ভব রাজ্যে কর্পূরক নামে এক রাজা বাস করেন। তাঁর ছেলেপুলে ছিল না কিছু। তাই রানীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তপস্যা শুরু করেন। তাঁর তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন। মহাদেব বলেন যে, রাজার সুন্দরী এক মেয়ে জন্মাবে। সেই মেয়ের স্বামী হবে মস্ত রাজা, বিদ্যাধরদের অধিপতি। ক'মাস বাদে রানীর গর্ভে সুন্দরী এক মেয়ে হল। রাজা তার নাম রাখলেন কর্পূরিকা।

রুদ্ধশ্বাসে নরবাহন বললেন, রাজকুমারীর বিয়ের কথা চলছে নাকি?

বুড়ী বলল, সে এক দুঃখের কথা বাবা। কর্পূরিকা যখন বড় হয়ে উঠল রাজা তখন তার জন্য পাত্র দেখতে লাগলেন। কিন্তু বিয়ের নামেই মেয়ে রেগে ওঠে। রাজা তার কারণ জানতে চান। তখন মেয়ে এক অদ্ভুত কাহিনী বলে। শোন, সে কাহিনী এবার।

কর্পূরিকা তার বাবাকে বলল, বাবা আমি জাতিস্মর। আমার আগের জন্মের কাহিনী শোন। তাহলেই সব বুঝতে পারবে। সমুদ্রতীরে বিরাট এক চন্দনগাছ আছে। তার কিছুটা দূরে আছে একটা পুকুর। সেই পুকুরে আমি আগের জন্মে রাজহংসী হয়ে বাস করতাম। আমার স্বামী রাজহংস ও আমি সমুদ্রের ভয়ে ভীত হয়ে সেই পুকুরেই বাসা বেঁধেছিলাম। আমার অনেকগুলি ছেলেপিলে ছিল। একদিন সমুদ্রের প্রবল ঢেউ-এর তোড়ে তারা সব কোথায় ভেসে চলে গেল। ছেলেদের শোকে পাগল হয়ে উঠলাম আমি।

আমার স্বামী কিন্তু নির্বিকার। বরং একদিন সে বলল, এত মুষড়ে পড়ছ কেন? যা গেছে গেছে। হারানো ছেলেগুলোর জন্য নিজেদের জীবনটা মাটি করে লাভ কি? স্বামীর কথা শুনে আমি অবাক। বলে কি? বাপ হয়ে এসব কথা বলা যায়? বুঝলাম পুরুষজাতটা নিষ্ঠুর। আমি মহাদেবের তপস্যা করে বর চাইলাম, পরজন্মে যেন জাতিস্মর হয়ে জন্মেছি। পূর্বজন্মের কথা সব মনে আছে আমার। ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দিলাম। আমিই সেই রাজহংসী। এ জন্মে জাতিস্মর হয়ে জন্মেছি। পূর্বজন্মের কথা সব মনে আছে আমার। মনে আছে স্বামীর নির্দয় ব্যবহারের কথা। এ জন্মে তাই আর বিয়ে থা করব না।

বুড়ীর মুখে কর্পূরিকার কাহিনী শুনলেন নরবাহন ও গোমুখ। বুড়ী বারবার নরবাহনদত্তের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

সুন্দর, সুপুরুষ, তিলকধারী।

বুড়ী বিড়বিড় করে মনে মনে বলে, এই কি সেই? এই কি সেই? দেখা যাক কি হয়।

গোমুখ এবং নরবাহনদত্তকে বুড়ী চমৎকার আপ্যায়ন করল।

পরের দিন সকালে।

নরবাহনদত্ত সন্ন্যাসীর বেশ ধরে গোমুখের সঙ্গে এলেন রাজপ্রাসাদের কাছে। সেখানে তিনি 'হায় আমার রাজহংসী, হায় আমার রাজহংসী' বলে কান্না শুরু করে দিলেন।

চারদিকে অনেক মানুষ জুটে গেল।

কি হয়েছে সকলে জানতে চায়।

রাজার কানে পেঁছাল খবরটা। রাজকুমারী কর্পূরিকাও শুনলেন। অবাক হলেন তিনি। দাসীদের কাছে বার বার শুনতে চাইলেন কি বলে নবাগত সুন্দর পুরুষটি চীৎকার করছে।

'হায় আমার রাজহংসী'—এই কথা বলছে! বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত কথাটা আঘাত করল তাঁর মনে। তবে কি সেই পুরুষও জাতিস্মর? পূর্বজন্মের কথা তাঁরও মনে আছে!

দারুণ কৌতূহল রাজকুমারীর মনে।

যে বেশ পরেছিলেন সেই বেশেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

হ্যাঁ, দাসীরা ঠিকই বলেছিল।

অপূর্ব সুন্দর পুরুষ। কেমন যেন ব্যাকুল। উদ্‌ভ্রান্ত। সামান্য একটা রাজহংসীর জন্যই কি এত শোক!

লজ্জা ত্যাগ করে রাজকুমারী তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি কে? কেনই বা রাজহংসীর জন্য আপনার এত শোক!

এই সুযোগই খুঁজছিলেন নরবাহনদত্ত। গোমুখের সঙ্গে আগেই পরামর্শ করা ছিল। সেই পরামর্শ অনুসারে কর্পূরিকার কথার উত্তর দিল গোমুখ। বলল, রাজকুমারী শুনুন তাহলে। সে এক দুঃখের কাহিনী। পূর্বজন্মে আমার এই বন্ধু ছিলেন এক রাজহংস। সমুদ্রতীরের কাছে এক সরোবরে ইনি স্ত্রী রাজহংসীর সঙ্গে বাস করতেন। সমুদ্রের প্রবল ঢেউ-এ এঁর ছেলেপিলে সব ভেসে যায়। স্ত্রীও মনের দুঃখে আত্মঘাতী হয়। পর পর এই রকম শোক পেয়ে ইনিও আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে ইনি জাতিস্মর রাজপুত্র হয়ে জন্মাবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। দেবতা সে প্রার্থনা পূরণ করেছেন। জাতিস্মর হয়ে এ জন্মে ইনি কৌশাম্বীর বৎসরাজের ছেলে নরবাহনদত্ত হয়ে জন্মেছেন।

কর্পূরিকা শুনতে শুনতে স্থানু হয়ে গেলেন। ইনিই তবে তিনি! তাহলে পূর্বজন্মে কর্পূরিকা স্বামীকে বুঝতে ভুল করেছিলেন। ছেলে এবং স্ত্রীর শোকে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারেন যিনি তিনি তো নির্দয় নন।

তবু সন্দেহ যায় না।

অথচ খোলাখুলি কিছু বলতেও পারেন না। সংকোচ হয়।

উন্মাদের ভান করলেও নরবাহন কর্পূরিকার মুখের ভাব ভাল করেই লক্ষ্য করছিলেন। গোমুখও ভাবছিলেন যে, ওষুধ ধরেছে তাহলে।

একটু থেমে গোমুখ বললেন, রাজকুমারী, আপনার নাম?

রাজকুমারীর সখী নাম বলে দিল।

গোমুখ মৃদু হেসে বলে, ঠিক ঠিক, এ না হয়ে যায় না। সব মিলে যাচ্ছে।

রাজকুমারী এবার মুখ খোলেন, কি বলছেন আপনি! কি মিলে যাচ্ছে?

গোমুখ বললেন, আমার জাতিস্মর বন্ধু আমাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বজন্মের স্ত্রীর খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কত দেশ দেশান্তর পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য আমরা পার হয়ে এলাম। পথের এক ঘটনা আমার মনে পড়ছে।

রুদ্ধশ্বাসে কর্পূরিকা বলেন, কি ঘটনা?

গোমুখ বলে, পথে এক তাপসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি বলেন যে, আমার বন্ধুর পূর্বজন্মের স্ত্রী এজন্মে কর্পূরসম্ভব নগরীর রাজকুমারী কর্পূরিকা হয়ে জন্মেছেন। এ রাজ্যের নাম তো আগেই জেনেছি। আপনার নাম সেইজন্যই জানতে চাইছিলাম।

কর্পূরিকা আর কথা বলতে পারেন না।

তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ নেই। পূর্বজন্মের স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন তিনি।

কর্পূরিকা বাবার কাছে গিয়ে খুলে বলল সব কথা। বলল যে, বিয়েতে তার আর অনিচ্ছা নেই। রাজাও মনে মনে আনন্দিত হলেন। মেয়ের ধনুক ভাঙা পণ ভেঙেছে তাহলে।

শুভদিনে কর্পূরিকার সঙ্গে নরবাহনের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরদিন নরবাহন স্ত্রীকে বললেন, চল এবার আমার রাজ্য কৌশাম্বীতে ফিরি।

স্ত্রী বলেন, চল। যে আকাশযানে তুমি এসেছ তাতেই ফেরা যাবে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল।

রাজ্যধর যে আকাশযান তাঁকে তৈরি করে দিয়েছিল তা দু'জনের উপযুক্ত। তিনজন যাবেন কি করে একসঙ্গে? সঙ্গে আবার যৌতুকের লটবহর আছে।

কর্পূরিকা বলেন, চিন্তা নেই। সে ভার আমার।

—তার মানে?

—আমি একজনকে খবর দেব। সে যন্ত্রযান তৈরি করতে জানে।

নরবাহন অবাক হতে থাকেন। রাজ্যধরের মুখে সব বৃত্তান্ত তিনি শুনেছিলেন। যন্ত্রযান তৈরি করতে জানে মাত্র দু'জন। রাজ্যধর আর প্রাণধর। তবে কি সেই পলাতক প্রাণধর এই রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে?

কর্পূরিকা যন্ত্রবিদকে খবর দিতে চলে গেলেন। যন্ত্রবিদ এল কিছুক্ষণ বাদে।

নরবাহন তাকে দেখামাত্রই প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রাজ্যধরের ভাই?

স্তম্ভিত প্রাণধর।—হ্যাঁ মহারাজ, কিন্তু আপনি আমাদের সব ঘটনা জানলেন কেমন করে?

এক এক করে রাজা নরবাহন বললেন সব কথা। প্রাণধর ভাই-এর খোঁজ পেয়ে খুব খুশী। তারই দোষে ভাই-কেও কষ্ট করতে হয়েছে। ভাই কোথায় আছে, কেমন আছে এই চিন্তায় এতদিন মনে বড় দুঃখ পেয়েছে। আজ খোঁজ মিলল।

প্রাণধরের বিরাট এক যন্ত্রযান তৈরি করা ছিল। নরবাহনদত্ত—কর্পূরিকা—গোমুখের জন্য সে সেই যান এনে দিল।

সেই যানে চড়ে নরবাহন ফিরলেন কৌশাম্বী। এতদিন বাদে রাজাকে পেয়ে রাজ্যে আনন্দের স্রোত বইল।

দুঃখের পরীক্ষা

নগরের নাম ইরাবতী।

রূপ এবং সৌন্দর্যে অনুপম নগর।

পরিত্যাগসেন সেই নগরের রাজা। তাঁর দুই রানী। অধিকসংগমা এবং কাব্যালংকারা। অধিকসংগমা রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়ে। কাব্যালংকারা অন্য এক রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়ে।

ধন সম্পদ ক্ষমতা সবই আছে রাজার।

তবু মনে তাঁর বড় দুঃখ।

ছেলে নেই। কে হবে তাঁর উত্তরাধিকারী? বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই।

তখন রানীদের সঙ্গে যুক্তি করে রাজা তপস্যায় বসলেন। কঠিন তপস্যা। অনাহারে দর্ভাসনে শুয়ে তপস্যা।

দেবী দুর্গা এঁদের তপস্যায় খুশী হলেন। তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, রাজা ওঠ। নাও এই দুটি ফল। তোমার দুই রানীকে খেতে দাও। তাহলে তোমার দুটি ছেলে হবে।

রাজার স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে দেখলেন দুটি সুন্দর ফল তাঁর বিছানার পাশেই পড়ে রয়েছে। স্বপ্নটা তাহলে মিথ্যে নয়। খুশী মনে তিনি ফল দুটি নিয়ে রানীদের স্বপ্নের কথা জানালেন।

সেদিন রাতের বেলায় প্রথমে অধিকসংগমাকে তিনি একটি ফল দিলেন। দ্বিতীয় ফলটি তাঁর কাছেই ছিল। সেটি কাব্যালংকারার। কিন্তু কাব্যালংকারা সে ফল আর পেল না। রাজা ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়তেই লোভে অধিকসংগমা দ্বিতীয় ফলটিও খেয়ে ফেলল।

রাজা জেগে উঠে ফলটি দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন করাতে অধিকসংগমা জানাল যে, দুটি ছেলের লোভে সে নিজেই ফলটি খেয়ে ফেলেছে।

মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন রাজা। কিন্তু যা হবার তা তো হয়েছে। কি আর করবেন? ক্ষমা চেয়ে নিলেন তিনি কাব্যালংকারার কাছে। কিন্তু ক্ষমা তো সহজে পাওয়া যায় না। কাব্যালংকারা খুব রেগে গেল। ছেলে না থাকলে রাজার ভালবাসা পাওয়া যাবে না। সব ভালবাসা পাবে ঐ রাক্ষুসে রানী, ঐ অধিকসংগমা। কাব্যালংকারার সব রাগ গিয়ে পড়ল অধিকসংগমার উপর।

তুষের আগুনের মত সেই রাগ ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগল।

কিছুদিন পরে ঘর আলো করে অধিকসংগমার দুই ছেলে হল। যমজ ছেলে। রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। রাজার সুখে প্রজারাও সুখী। উৎসবের আয়োজন হল।

রাজা একটি ছেলের নাম রাখলেন ইন্দীবর। তার চোখ দুটি ছিল নীল রঙের পদ্মফুলের মত সুন্দর। তাই এই নাম। আর একটি ছেলের নাম রাখলেন অনিচ্ছাসেন। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রানী দ্বিতীয় ফলটি খেয়েছিলেন। তাই অনিচ্ছাসেন নাম।

উৎসবের আনন্দে যখন রাজ্য মুখরিত তখন কাব্যালংকারা সেই উৎসবে যোগ দেয় নি। সে একা বসে বসে ভাবছে। রাজা তাকে কত অনুরোধ করেছেন, অধিকসংগমা নিজে এসে হাত দুটো জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব বৃথা।

কিছুতেই নড়ানো যায় নি তাকে।

কিসের উৎসব?

এই উৎসবে তার তো কোন অংশ নেই। উৎসব তার নয়।

অধিকসংগমার দুই ছেলে হয়েছে। তার তো নয়। উৎসব তো অধিকসংগমার। সে মাতুক। আনন্দ করুক। তাকে আবার টানা কেন?

দুঃখী কাব্যালংকারা একা একা বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে। হিংসার আগুনটা একবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় সবকিছু।

প্রতিশোধ!

তার মনে শয়তান গুণ গুণ করে ওঠে, প্রতিশোধ চাই। তোমার বঞ্চনার প্রতিশোধ।

মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তার। হ্যাঁ প্রতিশোধ নিতে হবে। যে যমজ ছেলে নিয়ে অধিকসংগমার এত গরব, সেই ছেলে দুটোকেই হত্যা করতে হবে। কিন্তু কৌশলে।

কাব্যালংকারার মনে শয়তান পুরোপুরি ভর করে।

হ্যাঁ, হত্যাই করতে হবে।

সে উপায় খুঁজতে লাগল।

এইভাবে দিন যায়। কালক্রমে রাজকুমাররা বড় হয়ে উঠল। তারা এখন যুবক। অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ। অভিযানে উদ্‌গ্রীব।

পরিত্যাগসেনকে তারা বলল, বাবা এবার আমাদের বেরোতে দিন। যুদ্ধে যেতে দিন। অস্ত্রবিদ্যা তো আমরা ভালভাবে শিখেছি। দেহের শক্তিও কম নয়। আমরা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ ছাড়া, বিজয় অভিযান ছাড়া কি চুপচাপ বসে থাকতে পারে?

রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের অনুমতি দিলেন। ক্ষত্রিয় বংশের ছেলে। রাজার ছেলে। যুদ্ধে তো একদিন না একদিন যাবেই।

কিন্তু তাদের বলে দিলেন, বাবারা, যাচ্ছ যাও। যখন বিপদে পড়বে তখন দুর্গাদেবীকে স্মরণ করবে। তাঁরই আশীর্বাদে জন্মেছ তোমরা। তাঁকে ভুলো না।

মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে দু'ভাই বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে থাকল বিরাট সৈন্যবাহিনী ও মুখ্যমন্ত্রী প্রথমসংগম। প্রথমসংগম তাদের

ঠাকুরদা। প্রবীণ তিনি, বিচক্ষণ এবং বহুদর্শী।

রাজকুমাররা প্রথমে গেল পূর্বদিকে।

পূর্বদিকের বহু রাজ্য জয় করল তারা। তারপর অগ্রসর হল দক্ষিণদিকে।

ইরাবতী নগরে আসতে লাগল তাদের বিজয়াভিযানের খবর। সকলে আনন্দিত হল। হিংসায় পুড়তে লাগল কাব্যালংকারা।

কি করা যায়! কি করা যায়!

এই তার দিন-রাতের চিন্তা।

অবশেষে সে এক উপায় খুঁজে পেল। হ্যাঁ ঠিক উপায়। হিংসার বাঁকা হাসি হাসল কাব্যালংকারা।

রাজার দুই ছেলে তখন দক্ষিণাপথে।

অনেক রাজ্য জয় করেছে। বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় তাঁবু খাঁটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ইরাবতী থেকে পরিত্যাগসেনের এক দূত সেই শিবিরে একটা গোপন চিঠি নিয়ে এল। চিঠিটা দুই ছেলের যুদ্ধের সঙ্গী সামন্ত-রাজাদের নামে। চিঠি পড়ে সামন্তরাজারা থ।

এ কি লিখেছেন মহারাজা?

—'আমার দুই ছেলের জন্য আমি ভীত হয়েছি। তারা ক্রমশ শক্তিমান হয়ে উঠছে। তাদের সঙ্গী হিসেবে সে কথা তোমরা জান। আমি গোপন খবর পেয়েছি যে, এরা এবার আমাকে বধ করার ষড়যন্ত্র করছে। তোমরা যদি রাজভক্ত হও তাহলে আমার দুই উচ্চাকাঙ্খী ছেলেকে হত্যা করবে। বাপ হয়ে আমার দ্বিধা নেই কেন, তা বুঝে তোমরাও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।'

সামন্তরাজারা দারুণ বিচলিত হল। তাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হল। বোধহয় রাজা ভুল খবর পেয়েছেন। রাজকুমারদের তারা তো দেখছে। সরল নিষ্পাপ। বাবার প্রতি তাদের ভক্তিও খুব। সেই বাবাকে বধ করে রাজত্ব চায় তারা? না, এ হতেই পারে না। এত প্যাঁচ তাদের মনে নেই। তাছাড়া রাজার মৃত্যুর পর তারাই তো রাজা হবে। আগেভাগে বাবাকে হত্যা করতে হবে কেন?

এরকম সাত-পাঁচ ভাবতে থাকে তারা।

কিন্তু স্বয়ং রাজার আদেশ।

আদেশ তো অবহেলা করা যায় না। তখন সকলে মিলে ঠিক করল, রাজনীতি বড় প্যাঁচালো জিনিস। আমরা চুনোপুঁটি আমরা তার কি বুঝব? রাজকুমারদের আমরা খুব ভালবাসি। কিন্তু কি আর করা যাবে? রাজার আদেশ তো লঙ্ঘন করা যায় না। রাজকুমারদের তাই বধ করতেই হবে।

সামন্তরাজাদের এই গোপন সিদ্ধান্তটা গোপনে জানতে পারলেন অধিকসংগম।

বিচক্ষণ মানুষ তিনি। আশপাশে অনেক চর রেখেছিলেন। একজন চর এই সংবাদ এনে দিল।

আর তো দেরী করা যায় না।

সেই রাত্রেই তিনি রাজকুমার দুজনকে বহুদূরে এক নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়ায় চড়ে রওনা হল তারা। কিন্তু পথ তো চেনে না। ঘুরতে ঘুরতে তারা বিন্ধ্যারণ্যে এসে পৌঁছাল। বিপদের উপর বিপদ। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাদের চোখের সামনেই ঘোড়াটা মরে গেল। ব্যস। এবার অন্ধকারে সেই গভীর বনে পায়ে হেঁটেই চলতে হবে।

কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন সব দিক থেকেই তাদের একমাত্র অবলম্বন, বিপদের ভরসা, মাতামহ অধিকসংগমও খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর অবস্থা ঘোরালো হল। রাতের শেষভাগে তিনি মারা গেলেন।

দুভাই হতাশ হয়ে পড়ল।

হায় রে হায়! এ কি দুর্বিপাক!

—আমাদের তো কোন দোষ নেই। অথচ এমন কষ্ট কেন? এমন বিপদের উপর বিপদ কেন? বাবা যে ছেলেকে হত্যা করতে আদেশ দেয় সে কথা আর শুনিনি। অথচ আমাদের বাবা সেইরকম আদেশ দিয়েছেন। বিমাতাকে খুশী করার জন্যই এমন আদেশ দিয়েছেন।

দুভাই দুঃখে ভাবছে এইসব। তাদের মনে পড়ল একটা কথা।

—আচ্ছা, বাবা বলেছিলেন না, বিপদে পড়লে দুর্গাদেবীকে স্মরণ করতে।

দুভাই মনে মনে স্মরণ করল দেবী দুর্গাকে।

কি আশ্চর্য, মুহূর্তেই যেন তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি সব দূর হয়ে গেল।

আবার চলতে শুরু করল তারা।

চলতে চলতে এসে পড়ল বিন্ধ্যারণ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরের সামনে। সেখানে তারা দেবীর প্রসাদলাভের জন্য তপস্যা শুরু করল।

এদিকে দক্ষিণাপথের শিবিরে দারুণ হৈচৈ। সামন্তরাজারা শুনল যে মাতামহের সঙ্গে রাজকুমাররা পালিয়েছেন। নিশ্চয়ই গোপনে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছেন। তাহলে তো সবাই ব্যাপারটা জেনে ফেলবে। রাজ্যের লোক তাদের ঘৃণা করবে।

তারা তাই কালবিলম্ব না করে ইরাবতীতে ফিরে গেল। রাজার আদেশ পালন করা হয় নি। অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা চেয়ে নেবে।

রাজা তাদের দেখে অবাক।

—তোমরা চলে এলে যে?

তারা আমতা আমতা করে, মহারাজ, আপনার আদেশ পালন করতে পারি নি।

রাজা ভাবলেন রাজকুমারের সঙ্গে সর্বদা থাকার আদেশের কথাই তারা বলছে বুঝি।

—তা তোমরা চলে এলে কেন?

—কি করব বুঝতে পারছি না—

—তার মানে?—রাজা ক্রমশ অবাক হন।

সামন্তরাজারা কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। রাজা আবার বললেন, রাজকুমারদের ফেলে চলে এসেছ?

তারা বলে, মহারাজ, তাঁদের ধরতে পারিনি।

—তার মানে? তার মানে?

রাজার বিস্ময়ের শেষ নেই।

—তাঁরা কোথায় পালিয়ে গেছেন।

—পালিয়ে গেছেন? ধাঁধাঁ লেগে যায় রাজার।—পালিয়ে গেছেন মানে?

সামন্তরাজারাও রাজার কথাবার্তার ধরনে কেমন হকচকিয়ে যায় যেন।

—মহারাজ, আমরা আপনার আদেশমতই কাজ করব বলে সকলে মিলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু অধিকসংগম বিচক্ষণ মানুষ, দূত মারফৎ খবর পেয়েই তিনি আমাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিলেন। আমাদের দোষ নেবেন না, আমরা গভীরভাবেই রাজভক্ত।

রাজা বুঝলেন কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে কিছু।

—আমার আদেশ মানে?

তড়িঘড়ি এক সামন্তরাজা সেই চিরকুটটা মেলে ধরল রাজার সামনে।

—এই যে মহারাজ, এই যে।

রাজার চোখ ছানাবড়া। তাঁরই হাতের লেখা নকল করে এই চিঠি কেউ লিখেছে। আর লিখেছেই বা কি? প্রাণের চেয়েও প্রিয় দুই ছেলেকে হত্যা করতে। রাজা বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই তিনি বুঝে নিলেন এর পেছনে কার হাত আছে।

সামন্তরাজাদের বললেন, তোমাদের বোকা বানিয়েছে। এ চিঠি আমার নয়। নকল। এত তপস্যা করে যে ছেলে পেয়েছি তাদের বধ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব! এটুকু বুঝতে চেষ্টা করলে ভুল করতে না।

সামন্তরাজারাও হতবাক।

এ চিঠি নকল—সে কথা স্বপ্নেও তারা কল্পনা করেনি। নিজেদেরও অপরাধী ভেবে নতমুখে তারা সব বিদায় নিল।

হাতের লেখা যে নকল করেছে রাজা তাকে খুঁজে বের করলেন। তার মুখ থেকেই বেরুল সব কথা। রানী কাব্যালংকারাও অপরাধ অস্বীকার করতে পারল না।

হত্যা-ষড়যন্ত্রের অপরাধে রাজা তাকে দিলেন কঠিন শাস্তি। মাটির নিচে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হল তাকে। লিপিকারকও শাস্তি পেল।

রাজার আদেশে রাজকুমারদের সন্ধানে দিকে দিকে লোক ছুটল। বাবার উপর অভিমান করে তারা যদি আত্মঘাতী হয়—এই হল রাজার ভয়।

ইন্দীবরসেন এবং অনিচ্ছাসেনের তপস্যাতে তখন দুর্গাদেবী সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি তাদের স্বপ্নে দেখা দিলেন।

ইন্দীবরসেনকে তিনি একটা খড়্গ দিয়ে বললেন, এই খড়্গের শক্তিতে তুমি হবে অজেয় বীর। তোমরা দু'জনেই কৃতকার্য হবে। অনেক দুঃখ পেয়েছ। দুঃখের পরীক্ষায় জিতেছ তোমরা। এবার সুদিন আসবে।

এরপর খড়্গ হাতে নিয়ে দুই ভাই নতুন উৎসাহে এগিয়ে চলল।

পথে তারা দেখল এক সুন্দর নগরী।

দেখেই মনে হয় ধনীলোকেদের বসবাস এখানে। তাদের খুব কৌতূহল হল।

রাজপথের উপর বসেছিল এক ভীষণ রাক্ষস। সে এই নগরীর দারোয়ান। তার কাছ থেকেই জানা গেল যে নগরীর নাম শৈলপুরী। রাজার নাম যমদ্রংষ্ট্র।

দু'ভায়ের ঝোঁক চাপলঃ এ রাজ্য তো জয় করতে হয় তবে।

রাক্ষস দারোয়ান বাধা দিল। কিন্তু খড়্গের এক আঘাতেই ইন্দীবর তার মাথা কেটে ফেলল। তারপর তারা বীরবিক্রমে সোজা গিয়ে উঠল রাজপ্রাসাদে।

সিংহাসনে যমদ্রংষ্ট্র বসে আছে। নামের মতই চেহারাখানা। তার দু'পাশে দুটি সুন্দরী মেয়ে।

ইন্দীবর যমদ্রংষ্ট্রকে যুদ্ধে আহবান করল।

কিন্তু এ কি ব্যাপার?

দেবীর দেওয়া খড়্গে বার বার যমদ্রংষ্ট্রের মাথা সে কেটে ফেলছে, আবার তক্ষুণি যমদ্রংষ্ট্রের মাথা গজিয়ে উঠছে।

তাজ্জব ব্যাপার।

এ কেমন মায়াবী রাক্ষস!

হঠাৎ ইন্দীবরের চোখ পড়ল যমদ্রংষ্ট্রের ডানদিকের সুন্দরী কুমারী মেয়েটির দিকে। মেয়েটি ইশারা করছে। ইন্দীবর বুঝল ইশারার মর্ম।

খড়্গের আঘাতে মাথাটা কেটে ফেলে আর এক আঘাতে সেই কাটা মাথাটা দু'টুকরো করে ফেলল। নতুন মাথা আর গজাল না। যমদ্রংষ্ট্র মরল।

কিন্তু আশ্চর্যের আরো বাকি আছে।

দুভাই দেখল যমদ্রংষ্ট্রের মৃত্যুতে মেয়ে দুটি খুব আনন্দিত। আনন্দ কেন?

—তোমরা কে? ইন্দীবর জানতে চাইল।

—কেনই বা রাক্ষসরাজের মৃত্যুতে তোমাদের এত আনন্দ?—অনিচ্ছাসেনের প্রশ্ন।

—তাহলে শোন। সুন্দরী কুমারী বলতে লাগল. এই নগরীতে এককালে বীরভূজ নামে এক রাজা বাস করতেন। এই যে সধবা নারীটিকে দেখছ—ইনি সেই বীরভূজের স্ত্রী। যমদ্রংষ্ট্র নামে এক রাক্ষস একদিন এই রাজ্যে আসে। বীরভূজকে সে মায়াবলে খেয়ে ফেলে. অনুচরদেরও হত্যা করে. কেবল বীরভূজের স্ত্রীকে অক্ষত রাখে। তারপর তাকে বিয়ে করে এই রাজত্বে রাজা হয়ে বসে। দ্বিতীয়বার বিয়ের পর এর নাম হয় মদনদ্রংষ্ট্রা।

ইন্দীবর দেখল মদনদ্রংষ্ট্রা তখন বীরভূজের শোকে কাঁদছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে যমদ্রংষ্ট্রের স্ত্রী হতে হয়েছিল।

ইন্দীবর সেই কুমারীকে প্রশ্ন করল. তুমি তবে কে? তুমি বা কেন আনন্দিত?

কুমারী বলল. আমার নাম খড়্গদ্রংষ্ট্রা। আমি যমদ্রংষ্ট্রের বোন। যমদ্রংষ্ট্র আমার ভাই ছিল বটে, কিন্তু বড় অত্যাচারী ছিল। তার জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। তাই তার মৃত্যুতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আর তাছাড়া রাজপুত্র ইন্দীবর, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে। মনে মনে তোমাকেই আমি স্বামী বলে বরণ করে নিয়েছি।

ছোট ভাই অনিচ্ছাসেনের তো খুব উৎসাহ। একটা বৌদি পাবে সে। সে দাদার বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দিল।

খড়্গদ্রংষ্ট্রার সঙ্গে ইন্দীবরের বিয়ে হয়ে গেল। সেই নগরেই তারা বাস করতে লাগল। অনিচ্ছাসেন দাদাকে বলল, অনেকদিন মা-বাবাকে দেখিনি। একবার ঘুরে আসি তাঁদের কাছ থেকে। কুশল সংবাদ দিয়ে আসি।

মা-বাবাকে দেখার জন্য ইন্দীবরেরও মন ছটফট করছে। ভাই-এর কথায় সম্মতি দিল সে।

এদিকে পরিত্যাগসেন দু'ছেলের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। খুঁজতে তো কোথাও আর বাকী রাখেন নি। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় নি। ছেলের শোকে রানী খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাজাও রাজকার্যে মন দিতে পারেন নি।

এমনি সময়ে অনিচ্ছাসেনকে অকস্মাৎ দেখে তাঁরা অবাক।

এ কি স্বপ্ন, না, সত্য!

চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না। আনন্দে জ্ঞান হারান রানী। রাজা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনিচ্ছাসেন তাদের সব কাহিনী বলে। শুনতে শুনতে ছেলেদের বীরত্বে রাজার বুক গর্বে ভরে ওঠে।

অনিচ্ছাসেন বলে, আমি কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করব না। দাদা ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করবে। তার কাছে ফিরে যাব। তারপর দাদা বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসব।

মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে পরদিন শৈলপুরে চলে গেল অনিচ্ছাসেন।

রাজপ্রাসাদে ঢুকে তো সে অবাক।

এ কি দৃশ্য!

খড়্গদ্রংষ্ট্রা আর মদনদ্রংষ্ট্রা ভীষণভাবে কাঁদছে। তাদের মাঝখানে পড়ে আছে তার দাদা ইন্দীবর। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে আছে সে।

—দাদা, দাদা—একি হল? আকাশফাটা চিৎকার করে উঠল অনিচ্ছাসেন।

বৌদির কাছে গিয়ে সে বলল, কিসে কি হল বল। এমন সর্বনাশ হল কি করে?

খড়্গদ্রংষ্ট্রা অনেক কষ্টে মাথা তুলল। ক্রমাগত কান্নায় তার চোখমুখ ফুলে গিয়েছে। ধরা গলায় সে বলল, আমারই দোষ ঠাকুরপো। আমারই দোষে তোমার দাদার এই অবস্থা।

—কি হয়েছে খুলে বল।

খড়্গদ্রংষ্ট্রা বলল, তুমি যাবার পরদিনের ঘটনা। আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পর পথে দূর থেকে দেখলাম আমার বৌদি মদনদ্রংষ্ট্রার সঙ্গে তোমার দাদা ফিসফিস করে কথা বলছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি তো

রাক্ষসের মেয়ে। বৌদি আর তোমরা সব মানুষের ছেলে। আমার মনে হল তোমার দাদা বোধহয় আমাকে তাড়িয়ে দেবে। আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। রাগে আর হিংসায় আমার সব বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে আমার হঠাৎ মনে হল, যে খড়্গের বলে তোমার দাদার এত বীরত্ব সেটাকে ধ্বংস করব। এই রকম ভেবে আমি করলাম কি—তোমার দাদা যখন ঘুমিয়েছিল—তখন খড়্গটাকে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলাম। আর যেই না ফেলা অমনি তোমার দাদা একবার জেগে উঠেই জ্ঞান হারালো।

কাঁদতে কাঁদতে খড়্গদ্রংষ্ট্রা বলল, বৌদিও আমাকে যা তা বলতে শুরু করল। আমি তখন আত্মহত্যা করব বলেই ঠিক করলাম। বৌদিও বলল সেও আমার পথ বেছে নেবে। এমনি সময়ে তুমি এসেছ।

অনিচ্ছাসেন সে সব কথা না শুনে বলল, কোথায় ফেলেছ খড়্গ?

খড়্গদ্রংষ্ট্রা সেই অগ্নিকুণ্ড দেখিয়ে দিল। আগুন তখন নিবে গেছে। অনিচ্ছাসেন হাতড়ে খড়্গটা তুলে নিল। দেবী দুর্গার দেওয়া খড়্গ, তা কি ধ্বংস হয়? আগুনে পুড়ে খড়্গটা বরং উজ্জ্বল হয়েছে।

অনিচ্ছাসেন বলল, অন্যায় করেছিলে, দেবী তার শাস্তিও দিয়েছেন।

খড়্গদ্রংষ্ট্রা তখন খড়্গটা দিয়ে বলল, এই খড়্গ দিয়ে তুমি আমাকে বধ কর। আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি?

অনিচ্ছাসেন তখন বিমূঢ় হয়ে সেই খড়্গ দিয়ে নিজেকে হত্যা করতে উদ্যত হল।

ঠিক এই সময়ে আকাশবাণী শোনা গেলঃ

> 'বৎস অনিচ্ছাসেন, আর নিজেকে হত্যা করতে হবে না।
> দেবী দুর্গা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তুমি তাঁর তপস্যা শুরু কর।
> সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আকাশবাণী শুনে অনিচ্ছাসেন মনের বল ফিরে পেল। সে দেবীর তপস্যা শুরু করল। দেবী তুষ্ট হলেন। দেবীর বরে ইন্দীবরের জ্ঞান ফিরল। দেবী অনিচ্ছাসেনকে আরো একটা রহস্যের কথা বলে দিয়েছিলেন। পূর্বজন্মে মদনদ্রংষ্ট্রা এবং খড়্গদ্রংষ্ট্রা এরা দু'জনেই ইন্দীবরের দুই স্ত্রী ছিল।

হাসতে হাসতে অনিচ্ছাসেন বলল, আমারই লাভ হল আখেরে। দুই বৌদি পেলাম।

এখন আর খড়্গদ্রংষ্ট্রা মদনদ্রংষ্ট্রাকে হিংসে করল না। অনিচ্ছাসেন দাদা ও বৌদিদের নিয়ে ইরাবতীতে ফিরে এল।

রাজ্যে আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল।

আত্মত্যাগের পুরস্কার

কে বলবে এই সেই বীরবর!

মালবদেশ থেকে যখন সে এসেছিল তখন তাকে যারা দেখেছে তারা অনেকদিন বাদে আজ যদি বীরবরকে দেখে তাহলে অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, ভোজবাজী নাকি?

প্রায় ছোটখাট রাজার সম্মান পাচ্ছে বীরবর।

রাজা বিক্রমতুঙ্গ সব ব্যাপারেই তার সংগে পরামর্শ করেন। বিক্রমতুঙ্গ অকৃতজ্ঞ নন। সকলের সামনেই বলেন তিনি, বীরবরকে খাতির করব না তো কাকে খাতির করব? সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

সব ভালো কাজেও খুঁত খুঁজে বেড়ানো স্বভাব যাদের, সেই নিন্দুকেরাও বীরবর সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না। অন্য কেউ হলে ঠিক বলত তারা, রাজার পোঁ ধরে এতদূর উঠেছ বাবা। নিজের কেরামতি আর কি?

কিন্তু বীরবর তাদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

গলাবাজি করে নয়, কাজে।

বক্তৃতায় সে কখনো পারদর্শী ছিল না। বরং কথা কমই বলত। সে তার কেরামতি দেখাত কাজে। হ্যাঁ, কেরামতি সে দেখিয়েছে বটে! আবার যন্ত্রও সে নয়। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা মুখ বুজে যন্ত্রের মত কাজ করে। তেমন নয় বীরবর। তার মন আছে, অনুভূতি

আছে, আবেগ আছে।

মন যদি না থাকত তাহলে কি এমন আত্মত্যাগ সে করতে পারত! এ কি কম কথা!

শুধু যদি মাসে মাসে বেতন-নেওয়া আর পাহারা-দেওয়া ভৃত্য হত সে রাজার, তাহলে সে নিশ্চয়ই আত্মত্যাগ করত না।

সে ভালোবেসেছিল রাজাকে।

নিজের জীবন দিয়ে রাজার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কে এই বীরবর? কিভাবে সে রক্ষা করেছিল বিক্রমতুঙ্গের জীবন?

কাহিনীটা গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

বিক্রমতুঙ্গ বিক্রমপুরের রাজা। রাজা ছিলেন ধর্মশীল, নীতিজ্ঞ। রাজ্যে প্রজারা বড় সুখে শান্তিতে ছিল। বিচার ফাঁকি দিয়ে পালাবার পথ ছিল না কারোর। দোষী শাস্তি পেত। ধার্মিকরা পেত পুরস্কার।

একদিন রাজ্যে এল এক বিদেশী। নাম তার বীরবর। সুঠাম সুন্দর স্বাস্থ্য। দেখে মনে হয় সাহসী, বীরপুরুষ। মালব দেশ থেকে এসেছে। রাজার কাছে কাজ চায়। সংসার খুব বড় নয় তার। ধর্মবতী নামে স্ত্রী, বীরবতী নামে মেয়ে আর ছেলে সত্ত্বর। রাজা তাকে দেখে মুগ্ধ।

—কি চাই?

—কাজ মহারাজ। জীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছি দেশ ছেড়ে।

—কি করতে পার?

—আমাকে পাহারার কাজে লাগাতে পারেন।

রাজা আবার দেখেন তাকে।

ইস্পাতের মত পেটানো শরীর। কোমরে খড়্গ ঝুলছে। এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে ঢাল। মুখে সাহস ও সরলতার ছাপ।

—কাজের বিনিময়ে কি চাও?

—প্রতিদিন পাঁচশ দীনার।

এত? মনে মনে চমকালেন রাজা।

তিনজনকে নিয়ে পরিবার। কিন্তু এত চাহিদা কেন? অথচ চাওয়ার মধ্যে দীনতা নেই। যেন প্রার্থনা নয়, দাবি। দীনতা থাকবে

কেন বীরপুরুষের? এ তো ভিক্ষা নয়। শ্রমের বিনিময়ে পারি শ্রমিক।

মনে মনে রাজার পছন্দ হয়েছে বীরবরকে।

সন্দেহ নেই, যোগ্য লোক।

রাজা বহুদর্শী। অনেক দেখেছেন, অনেক তাঁর অভিজ্ঞতা। মানুষ চিনতে ভুল হবে কেন? কিন্তু এর পাঁচশ দীনার কি হবে?

মনের কথা মুখে রাজা প্রকাশ করলেন না। তিনি গোপনে পরীক্ষা করবেন। দেখবেন লোকটা এত টাকা নিয়ে কি করে।

বীরবর কাজে নিযুক্ত হল।

মাইনে নিয়ে সে কি করে তা দেখার জন্য রাজা তার পেছনে চর লাগালেন।

চর ফিরে এসে বলল, মহারাজ বীরবর প্রতিদিন খাবারদাবারের জন্য তার স্ত্রীকে একশ দীনার দেয়, একশ দীনারে সে কাপড়চোপড় ইত্যাদি কেনে, বিষ্ণু ও শিবের পুজোর জন্য একশ দীনার খরচ করে, আর বাকী দু'শ দীনার সে ব্রাহ্মণ ও গরীবদের দান করে।

মনে মনে এই রকমই ভেবেছিলেন রাজা।

বীরবরের শুধু সাহাস ও শক্তি নেই। আছে মন, আছে উদারতা ও দয়া।

পরীক্ষা করে রাজা খুশী। প্রথম দর্শনেই বীরবর তাঁর মন জয় করে নিয়েছিল। এখন সে রাজার বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠল।

রাজপুরীর সিংহদ্বারে সে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাহারা দিত। তারপর অল্প একটু সময়ের জন্য বিশ্রাম। বাড়ি যেত সে। পুজো সেরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ফিরে আসত কাজে। সারা রাত ধরে সে পাহারা দিত।

লোকে বলত, হ্যাঁ এতদিনে লোক পেয়েছেন বটে রাজা। অচল অটল পর্বতের মত রাজদ্বারে বীরবর দাঁড়িয়ে থাকে তো থাকেই। ক্লান্তি নেই এতটুকু, ফাঁকি নেই। যোগ্য লোক।

এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে এল সেই ভয়ঙ্কর রাত।

সারা আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার মেঘের অন্ধকারের আরো গাঢ় হয়ে গেল। মেঘের ভীষণ গর্জন। বিদ্যুত

বজ্রের দাপাদাপি। মনে হল আজ পৃথিবীর উপর আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি। রাস্তা জনশূন্য। দরজা জানালা সব বন্ধ। বীরবর কিন্তু সিংহদ্বারে ঠিকই আছে।

যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভয়কে সে জয় করেছে। আর কিসের ভয়?

রাজপ্রাসাদে রাজার চোখেও ঘুম নেই। কি যেন এক আশঙ্কা তাঁকে ভীত করে তুলছে। কিসের এক ছায়া যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন। অথচ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন না কিছু। মনে হচ্ছে একটা মস্ত বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে। সেই বিপদে তিনিও জড়িয়ে পড়বেন বুঝি। কিন্তু বিপদটা কিসের? সুরক্ষিত রাজ্য তাঁর। বাইরের শত্রুর আক্রমণের ভয় নেই। অসংখ্য গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে রাজ্যের ভেতরে বাইরে। তাদের মুখেই আগে খবর পাওয়া যাবে। প্রস্তুতির সময় পাবেন। সৈন্য বা অস্ত্রবল তো কম নয় তাঁর। তবে কি রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ? প্রজা বিদ্রোহ? সে সম্ভাবনা নেই। প্রজাদের মন বোঝেন তিনি। তিনি তো স্বৈরাচারী রাজা নন। প্রজাদের প্রাণভরে ভালোবাসেন। নিজের ভোগবিলাস নিয়ে মত্ত থাকেন না তিনি। খুশীমত হুকুম করেন না। নিজের দায়িত্ব ও অধিকারের সীমারেখা মেনে চলেন। তাহলে কিসের ভয়? কিছুর একটা ভয় নিশ্চয়ই। দুলছে যেন অমঙ্গলের কালো একটা ছায়া। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না তিনি। তাহলে কি গোপন কোন আততায়ী আসছে? আসবে কি করে বীরবরের চোখ এড়িয়ে?

বীরবর।

বীরবরের কথা মনে হতেই রাজার সব ভয় দূর হয়ে গেল।

এইরকম সাহসী, উদার, অকুতোভয় সঙ্গী ও প্রহরী যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোন ভয় নেই।

প্রচণ্ড শব্দ করে কোথায় একটা বাজ পড়ল।

ঘর-বাড়ি কেঁপে উঠল শব্দে।

মুষলধারে বৃষ্টি সমানে। আকাশে বুঝি প্রলয় নাচন শুরু হয়েছে। এই ভীষণ রাত্রে বীরবর যদি না থাকে তাহলে দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু যদি না থাকে বীরবর, তাহলে—

তাহলে—তাহলে—

আবার ভয়ের ছায়াটা দুলে উঠল।

নাঃ, বীরবর থাকবেই। এর আগে অনেকবার পরীক্ষা করেছেন তিনি। তবশ্য আজকের রাতে বীরবর না থাকলে কিছু বলতে পারবেন না তিনি। আর না যদি থাকে বীরবর তাহলে গোপন আততায়ী সুযোগ পেয়ে চুপি চুপি—

মাথাটা গরম হয়ে উঠল রাজার। ভয়ের ছায়াটা দুলতেই লাগল। মনকে স্থির করে রাজা ভাবলেন, দেখাই যাক না বীরবর আছে কি নেই!

জানালাটার একটা পাল্লা কোনমতে খুললেন তিনি। মত্ত বাতাস হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

—কে আছ পাহারায়? চিৎকার করে ডাকলেন রাজা, আছ কি কেউ?

শান্ত দৃঢ়স্বরে বীরবর জানালো, আছি আমি মহারাজ। আমি বীরবর।

আশঙ্কা দূর হল রাজার।

নিজের চিন্তা থেকে বীরবরের চিন্তায় ফিরে এলেন তিনি। বীরবর যেন দায়িত্বশীলতার জীবন্ত মূর্তি। আগামীকালই রাজা তাকে আরো পুরস্কার দেবেন। পুরস্কার অপাত্রে নয়, সুযোগ্য পাত্রে! তাকে দেখে রাজ্যের লোক শিখুক, দায়িত্ব পালন কি ভাবে করতে হয়।

মনে মনে রাজা এইসব ভাবছেন, এমনি সময়ে দূর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমে অস্পষ্ট, পরে ক্রমশ স্পষ্ট হল শব্দটা।

কোন মেয়ের কান্না।

কান্না না বলে বুকফাটা আর্তনাদ বলা ভাল। ঝড়ের গর্জনকে ভেদ করেও সেই কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

কে কাঁদে?

রাজা ভাবতে লাগলেন, আমার রাজ্যে তো কোন দুঃখী ব্যক্তি নেই। কে কাঁদে তবে?

—বীরবর—রাজা ডাকলেন।

—বলুন মহারাজ! ওপাশ থেকে সাড়া এল।

—শুনতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—কে কাঁদে?

—কোন স্ত্রীলোক। কিন্তু কে সে বুঝতে পারছি না তো!

—যাও। কাছে গিয়ে দেখে এস।

—যাচ্ছি মহারাজ।

খড়্গ হাতে নিয়ে বীরবর বেরিয়ে গেল। কিন্তু বীরবর জানলো না যে ছদ্মবেশে আর একজন তাকে অনুসরণ করছেন। হ্যাঁ, কৌতূহলী রাজাই তাকে অনুসরণ করছিলেন।

দ্রুত পথ চলছে বীরবর।

কান্নার শব্দ অনুসরণ করতে করতে সে এসে পৌঁছাল নগরের বাইরে একটা পুকুরের ধারে।

বিদ্যুতের আলোয় বীরবর দেখল একটি সুন্দরী মেয়ে সেই পুকুরের ধারে বসে কাঁদছে। আকুল কান্না। আর বার বার বলছে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে?

বীরবর এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বলল, মা, আমি এই রাজ্যের রাজার প্রহরী। তোমার কি হয়েছে বল। কেন কাঁদছ তুমি?

বীরবরের কথা শুনে কান্না থামল মেয়েটির। মুখ তুলে সে বলল। বাবা আমি এই নগরীর লক্ষ্মী। একটা দারুণ দুঃসংবাদের কথা ভেবে আমি কাঁদছি।

—কিসের দুসংবাদ মা?

মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল।

—বুক ফেটে যায় বাবা সে কথা বলতে।

বীর বীরবর বলে, নির্ভয়ে বল মা। আমার যতদূর সাধ্য করব। চেষ্টা করব প্রতিকার করতে।

—বাবা, আজ থেকে তিনদিন পরে রাজা বিক্রমতুঙ্গের মৃত্যু হবে—

দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা রাজার বুকটা ধক্ করে কেঁপে উঠল: যে ছায়াটা দুলছিল, সেটা তাহলে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া! রাজা দেখলেন নগরলক্ষ্মীর কথা শুনে বীরবরের হাতের খড়্গাটাও কেঁপে উঠছিল।

কিন্তু মাত্র একটুক্ষণের জন্য।

স্থিরবুদ্ধি বীরবাহু। বিপদে সে বিচলিত হয় না। দ্রুত তাই

নিজেকে সামলে নিল।

—মা, এর কোন প্রতিকার নেই?

—রাজার মৃত্যুর?

—হ্যাঁ? একে রোধ করা যায় না?

—যায় বাবা। মেয়েটি ভাঙা ভাঙা স্বরে উত্তর দিল, কিন্তু সে যে বড় কঠিন কাজ।

—বল, তুমি উপায়টা বল। যত কঠিনই হোক, মানুষ সব পারে।

—হ্যাঁ পারে। তবে কি জান, প্রত্যেকের কাছে তার নিজের জীবনটাই তো বেশী প্রিয়—

এ কেমন হেঁয়ালী!

বুঝতে পারে না বীরবাহু।

—তার মানে?

—তার মানে রাজার জীবন বাঁচাতে হলে অন্য জীবন বলি দিতে হবে।

—ও, এই কথা। হাঁফ ছাড়লো বীরবাহু। যেন অতি সহজ কাজ। বলল, আমি রাজার জন্য নিজের জীবন বলি দিতে চাই।

—পারবে তুমি? মেয়েটি আবার বলে, কিন্তু তোমার নিজের জীবন দেওয়ার চাইতেও যদি কাজটা কঠিন হয়?

এবার একটু অধৈর্য হল বীরবাহু।

—প্রথমে তো নিজের জীবন বলি দেওয়ার কথাই বললে! বেশ, তার চেয়ে কঠিন কাজ যা আছে বলে যাও। পারব আমি। রাজার ভালোবাসা ও স্নেহের ঋণ শোধ করার জন্য সব কাজই পারতে হবে আমায়। বল। বল তুমি।

আড়ালে রাজা অবাক। রাজা বিস্মিত।

মেয়েটিও আশ্বস্ত হল।

—তোমার ছেলেকে চণ্ডীদেবীর কাছে বলি দিতে হবে বীরবাহু।

কোন বিকার নেই বীরবাহুর।

শান্তভাবে সে বলল, বেশ। একটু সময় দাও। বাড়ি যাই। আনি ছেলেকে।

বীরবর দ্রুতবেগে বাড়ি ফিরল।

রাজাও চলেছেন পেছন পেছন। কেমন একটা আচ্ছন্নের ভাব তাঁর

মনে। তিনদিন বাদে মৃত্যু তাঁর। মৃত্যু! নগরলক্ষ্মী বলেছিলেন নিজের জীবনই সবচেয়ে প্রিয় মানুষের কাছে। মৃত্যু! তিনদিন বাদে তাঁর মৃত্যু হবে। কথাটা শোনার পর কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মন। যন্ত্রের মত চলছেন তিনি। বীরবর তার ছেলেকে ডাকতে যাচ্ছে। বলি দেবে।

বাড়ির সকলে ঘুমে অচেতন।

গভীর রাত।

বীরবর প্রথমে ডেকে তুলল স্ত্রীকে।

ধড়মড়িয়ে স্ত্রী উঠে বসল। এমন অসময়ে স্বামী এল কেন? তবে কি কোন বিপদ ঘটল?

বীরবর ধীরস্থিরভাবে এক এক করে বলল সব। আশ্চর্য, স্ত্রীও উত্তেজিত হল না। যোগ্য স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। স্ত্রী বলল, ছেলেকে জাগাও। বল সব তাকে।

বীরবর জাগালো ছেলেকে।

সত্ত্বর সব শুনে বলল, বাবা, মৃত্যুকে—ভয়কে জয় করার শিক্ষা তোমার কাছে পেয়েছি। আমার জীবন দিয়ে যদি মহৎ কিছু হয় তাহলেই আমার আনন্দ।

আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাজা। স্থানুর মত। শুনছেন এদের কথাবার্তা। এরা কি মানুষ? অবাক হওয়ার বোধ রাজা হারিয়েছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বীরবর।

সংগে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। রাত্রির অন্ধকারকে ছিঁড়ে চারটি আলোর শিখা এগিয়ে চলেছে যেন। পেছনে অন্ধকারের মধ্যে মিশে রাজা চলেছেন চুপচাপ। চলেছেন যন্ত্রের মত।

চণ্ডীদেবীর মন্দির।

সত্ত্বর নিজে বাবার হাতে খড়্গ তুলে দিল। বলল, বাবা, মনে দুঃখ রেখ না। তুমি তো শিখিয়েছিলে নিঃশেষে যে প্রাণ দান করে তার মৃত্যু নেই। আমার জীবন দিয়ে আর একজনের জীবন রক্ষা পাবে। তুমি আর দ্বিধা করো না বাবা, দেরী করো না।

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়লো বীরবাহুর।

তারপর দৃঢ় হল। খড়্গ তুলে নিল।

তারপর দেবীর মন্দিরে ছিটিয়ে পড়ল রক্ত—

দ্বিখণ্ডিত বলিকের দেহ—

বীরবরের শরীর একবার একটু কেঁপে উঠল। একবার মাত্র। তারপর স্থির। কিন্তু চোখের সামনে এমন দৃশ্য সহ্য করতে পারল না সেই ছোট মেয়ে বীরবতী। সে আচমকা ছুটে গিয়ে ভাই-এর কাটা মুণ্ড তুলে নিল। আকস্মিক আঘাতে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

পাগলের মত ছুটে এল স্ত্রী।

বীরবর বাধা দেবার আগেই খড়্গটা বসিয়ে দিল গলায়।

শেষ, সব শেষ।

আপন মনে সে বলল, আমার কর্তব্য পালন করেছি। এবার আমাকে নিষ্কৃতি দাও। ছেলে গেল, মেয়ে গেল, স্ত্রী গেল—আর আমি বেঁচে থাকি কেন?

বীরবর খড়্গ হাতে তুলে নিল।

ঠিক সেই সময় দেবীর আবির্ভাব।

—না, আত্মহত্যা করো না বীরবর।

বীরবর প্রণাম করল দেবীকে।

—তুমি বর চাও বীরবর।

বীরবর বলে, আপনি যখন খুশী হয়েছেন তখন আমাকে দু'টি বর দিন দেবী। প্রথম বর রাজা যেন দীর্ঘজীবন লাভ করেন। আর দ্বিতীয় বর—আমার নিজের ব্যাপার—

—বল, বীরবর, সঙ্কোচ করো না।

বীরবর বলল, আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জীবন দিন। তাদের ছাড়া বাঁচব কেমন করে আমি?

দেবী দু'টি বরই দিলেন।

এতক্ষণে আড়ালে থাকা রাজার চেতনা হল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে দ্রুতগতিতে কত কি ঘটে গেল। জীবন ও মৃত্যুর নাটকই হয়ে গেল একটা।

হাসি ফুটল রাজার মুখে।

সবদিক রক্ষা হয়েছে।

বীরবাহুর ছেলের জীবনদানে তিনি যদি জীবন ফিরে পেতেন তাহলে আজীবন আত্মগ্লানিতে ভুগতে' হত তাঁকে। শেষ পর্যন্ত

জীবন কারোকেই দিতে হল না।

বীরবাহু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বাড়িতে রেখে আসতে গেল। রাজাও গোপনে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরের দিন সকালে রাজা বীরবাহুকে ডাকলেন।

—বীরবাহু কি হয়েছিল কাল রাতে?

বীরবাহু বলল, একটি মেয়ে কাঁদছিল। তার কাছে গেলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না। তখন আর কি করি, ফিরে এলাম।

মিথ্যে কথা বলল বীরবাহু।

সত্যি কথা বললে আত্মমহিমা প্রকাশ পাবে যে!

রাজা বুঝলেন।

বীরবাহু শুধু বীর নয়, বিনয়ী।

রাজা নিজেই রাজসভায় গত রাতের রোমাঞ্চকর ঘটনা সবিস্তারে বললেন। সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।

আত্মত্যাগের পুরস্কার পেল বীরবাহু।

ধনরত্ন তো পেলই, পেল রাজার বন্ধুতা।